মিলন-মালা

শ্রীইন্দুভূষণ দাস

৩৪সি, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র জয়ন্তী—১৩৭১

প্রকাশক : মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
মনোহর সাহিত্য মন্দির
৩৪সি, আমহার্স্ট রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬



মিনল-মালা

॥ এক ॥

দেশীয় রাজ্য সিংহগড়।

রাজ্যটি ছোট। কিন্তু রাজ্য ছোট হলেও রাজার দাপট কম নয়। কম হবেই বা কেন? হাতে মাথা কাটবার ক্ষমতা আর যথেচ্ছ ব্যয় করবার মত টাকা থাকলে দাপট কম হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।

রাজ্যের অধীশ্বর হিজ হাইনেস স্যর নরেন্দ্র সিংজী কে, সি আই, ই, কে, সি, ভি, ও মহোদয় দীর্ঘ ব'ত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রবল পরাক্রমে রাজ্য শাসন করে চলেছেন। পরাক্রমটা অবশ্য নিরীহ প্রজাদের ওপরেই খাটিয়ে এসেছেন তিনি; কারণ, অন্যত্র ও জিনিসটি দেখাবার সুযোগ তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ রাজশক্তির ছত্রছায়া তলে বসে বিলাস ব্যসনে দিন কাটিয়েছেন তিনি। এবার তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর কয়েকদিন পরেই তিনি পঁয়ষট্টি বছরে পড়বেন।

সিংহগড় রাজ্যের বিধান অনুসারে রাজার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হয় উত্তরাধিকারীকে। মহারাজা তাই স্থির করেছেন যুবরাজ বিজয় সিংকে গদীতে বসিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। যুবরাজ বিজয় কিন্তু মহারাজের নিজের ছেলে নয়। সে হলো মহারাজার ছোট ভাই স্বর্গত নগেন্দ্র সিংজীর বড় ছেলে। মহারাজা নিঃসন্তান বলে বিজয় সিংহ হয়েছে যুবরাজ এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

যুবরাজ বিজয়ের এক যমজ ভাই আছে, তার নাম অজয় সিং।

কিন্তু এক ঘণ্টা পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে সিংহাসনের ওপর তার কোন দাবা চলবে না। যুবরাজ বিজয়ের বয়স ত্রিশ পার হয়ে গেছে। এখনও সে অবিবাহিত। এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করবার কারণ সম্বন্ধে লোকে অবশ্য অনেক কথাই বলাবলি করে। কিন্তু আড়ালে আবডালে

বলাবলি করলেও যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার সাহস কারোরই নেই।

এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার। সিংহগড় রাজ্যের প্রচলিত বিধান অনুসারে যুবরাজকে অবশ্যই কোন রাজবংশের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। রাজবংশের মেয়ে ছাড়া অন্য কোন মেয়ে বিয়ে করলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার আর তাঁর থাকবে না।

এদিকে যুবরাজ বিজয়ের বিয়ে না হলেও তার ছোট ভাই অজয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রীর নাম অঞ্জনা দেবী। রাজবংশের শিক্ষিতা মেয়ে সে। রূপে, গুণে, শিক্ষায়, কৃষ্টিতে অঞ্জনা দেবী অতুলনীয়। রূপ, শিক্ষা এবং বংশ গৌরবে গরবিণী এই মহিলার বুদ্ধিও প্রখর। সত্যি কথা বলতে কি, অঞ্জনার মত বুদ্ধিমতী নারী সারা সিংহগড় রাজ্যে তখন আর কেউ নেই। অঞ্জনার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত বেশি যে, সময় সময় স্বামীর সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ ঘটতে দেখা যেতো।

অজয়ের স্বভাবটি কিন্তু উল্টো। ধীর, স্থির এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ সে। সামান্য কারণে মাথা গরম করা বা কোন কিছু নিয়ে হৈ চৈ করা এর স্বাভাব বিরুদ্ধ। রাজ্যের কিসে উন্নতি হয়, কি ভাবে রাজ্যের বন-সম্পদ এবং খনিজ-সম্পদকে কাজে লাগানো যায়, এই নিয়েই সে সব সময় কর্মব্যস্ত থাকে।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে, বিজয় তখন কলকাতায়। এদিকে যুবরাজের চালচলন এবং গতিবিধির প্রতি গোপনে নজর রাখবার জন্য অঞ্জনা দেবী একজন বিশ্বস্ত লোককে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। লোকটির নাম নন্দকিশোর।

এই নন্দকিশোর প্রেরিত এক গোপন পত্রকে ভিত্তি করেই কাহিনীর সূত্রপাত।

॥ দুই ॥

অজয় আর অঞ্জনার মধ্যে কথা হচ্ছে অঞ্জনা দেবীর খাটের ওপর বসে। তার হাতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ। উত্তেজিতভাবে অঞ্জনা বললো—এই অস্ত্র হাতে পেয়েও তুমি যদি পিছ্-পা হও, তাহলে বুঝবো যে, তুমি একটি ভীরু, কাপুরুষ।

স্ত্রীর কথার উত্তরে প্রিন্স অজয় হাসিমুখে বলেন—তুমি যাই বলো অঞ্জনা এটা ঠিক ন্যায় সম্মত হবে না।

অঞ্জনা আর'ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে স্বামীর কথা শুনে খাট থেকে নিচে নেমে প্রিন্স অজয়ের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করে— "রেখে দাও তোমার নীতি-শাস্ত্রের কথা। রাজসিংহাসনের জন্য পৃথিবীতে কি হয়নি? ছেলে বাপকে কারারুদ্ধ করেছে। ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়েছে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করেছে এবং আরও কত কি হয়েছে এই সিংহাসনের জন্য।

এই বলে একটু দম নিয়ে অঞ্জনা আবার বলে—"আমরা তো আর সে রকম কিছু করতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু যুবরাজের বিয়ের কথাটা ফাঁস করতে চাইছি মহারাজের কাছে। তুমি তো জানো, এই রাজ্যের বিধান অনুসারে যুবরাজকে রাজবংশের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। সে যদি রাজবংশের মেয়ে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে সিংহাসনের দাবী তাকে ছাড়তে হবে।"

অঞ্জনার কথায় বাধা দিয়ে অজয় বলে—"অতটা উত্তেজিত হয়ো না অঞ্জনা। নন্দকিশোর যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা তো মিথ্যাও হতে পারে।"

—না, সঠিক না জেনে কিছুতেই সে আমাকে এমন একটা ব্যাপার লিখতো না। এই ছাখো না, সে কি লিখেছে—

এই বলে চিঠিখানা খুলে পড়তে সুরু করলে অঞ্জনা—"আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে, যুবরাজ এখানে সুপ্রিয়া ব্যানার্জী নামে এক অভিনেত্রীকে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে বিয়ে করেছেন। যুবরাজ নিজের পরিচয় গোপন করে দিলীপ সিংহ ছদ্মনামে এই বিয়ে করেছেন। কিন্তু এই দিলীপ সিংহ যে যুবরাজ বিজয় তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। যুবরাজ এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে হোটেল মিডল্যাণ্ডে বাস করছেন। দিলীপ সিং নামেই সেখানে তিনি পরিচিত।

চিঠিখানা পড়া হয়ে গেলে ভাঁজ করতে করতে বলে—"এর পরেও তুমি বলতে চাও যে, নন্দকিশোর মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছ ?"

অজয় নিরুত্তর কণ্ঠে বলেন,—"তবুও আমাদের ভেবে দেখা উচিত, এ কাজ করা ঠিক হবে কিনা !"

—বেশ, তুমি তাহলে বসে বসে ভাবতে থাকো। আমি নিজেই যাচ্ছি মহারাজার কাছে।

—সে কি ! তুমি নিজে যাবে মহারাজার কাছে ?

—নিশ্চয়ই। স্বামী যেখানে অপদার্থ, কাপুরুষ, সেখানে এ কাজ আমাকেই করতে হবে।

—পাগলামী করো না অঞ্জনা। ভেবে দেখো, সাপ নিয়ে খেলা করতে যাওয়া হচ্ছে।

—সাপের ভয়ে অঞ্জনা কখনো পিছিয়ে যাবে না। ভয় করতে হয় তুমি করোগে !

—তাহলে তুমি এ কথা মহারাজার কাছে বলবেই ?

—নিশ্চয়।

—থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না। চিঠিখানা আমাকে দাও, আমিই যাচ্ছি। অজয়ের এই কথায় হাসি ফোটে অঞ্জনার মুখে। সে বলে—"এতক্ষণে সুমতি হলো তাহলে ?"

এই বলে চিঠিখানা অজয়ের হাতে দেয় অঞ্জনা। চিঠিখানা নিয়ে অজয় বলে,—"কি দরকার আমাদের সিংহাসনে বলতো ? কিসের

অভাব আমাদের ? তুমি কি জানো না যে, এই চিঠি মহারাজের কাছে দাখিল করবার পর এ রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বলে উঠবে !”

অঞ্জনা আবার সাপের মত ফোঁস করে ওঠে এই কথা শুনে। বলল—বুঝেছি, এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না। দাও, আমায় চিঠি ফিরিয়ে। আগুনের ভয় আমি করি না। তাছাড়া, আমি বুঝতেই পারছি না, এত সঙ্কোচ, ভয় তোমার কেন ? বিজয় তোমার চাইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ? তবু মানতাম, যদি সে রাজ্যের বিধান মেনে চলতো। সে যেখানে জেনে শুনে এ কাজ করেছে, সেখানে তাকে তার ফলভোগ করতেই হবে।”

এই বলে একটু চুপ করে থেকে অঞ্জনা আবার বলে - “তোমার গুণধর দাদাটি যদি প্রেমের জন্যই অভিনেত্রীকে বিয়ে করে থাকে, তাহলে সিংহাসনের দাবি ছাড়তেও তো তার আপত্তি হবার কথা নয়। সিংহগড়ের রাজগদী তো কোন ছার, অভিনেত্রীর প্রেমে বৃটিশসাম্রাজ্যের সিংহাসনও ছেড়েছেন এডওয়ার্ড দি এইট্থ—এ খবর নিশ্চয়ই জানো !”

—বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক দেখা যাক এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই বলে চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান অজয়।

।। তিন ।।

হিজ হাইনেস স্যর নরেন্দ্র সিংজীর বিশ্রাম কক্ষ। একখানি মহামূল্য আসনে দেহ এলিয়ে দিয়ে গড়গড়ায় ধুমপান করছেন মহারাজা। এই সময় অজয় কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

তাঁকে দেখে মহারাজা প্রশ্ন করলেন—কি খবর অজয়? আমাকে কিছু বলবে কি?

—হ্যাঁ তাওজী।

—কি বলতে চাও বলো।

—কথাটা যুবরাজের সম্বন্ধে এবং খুব গোপনীয়।

—বিজয়ের সম্বন্ধে! গোপনীয়! কি ব্যাপার বলো তো?

—আপনি কিছু শুনেছেন কি ওঁর সম্বন্ধে?

—না। কি করেছে বিজয়?

—দাদা বিয়ে করেছেন।

—বিয়ে করেছে! বলো কি! কাকে? কোথায়?

—কলকাতায় এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন তিনি।

- না না, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

—আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, কথাটা সত্যি।

—কোন প্রমাণ পেয়েছ?

—প্রমাণ পেয়েই বলছি। এই দেখুন।

এই বলে পকেট থেকে নন্দকিশোরের চিঠিখানা বের করে মহারাজার হাতে দেয় অজয়।

মহারাজা চিঠিখানা পড়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। পরে বললেন—এ চিঠি তো মিথ্যাও হতে পারে?

—যুবরাজের নামে মিথ্যা কথা লিখবে, এতটা সাহস নন্দকিশোরের হবে বলে তো মনে হয় না।

—নন্দকিশোরকে যুবরাজের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে কে? তুমি?

অজয় চুপ করে থাকে।

মহারাজা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অজয়কে চুপ করে থাকতে দেখে। অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে তিনি আবার বললেন—"কি, চুপ করে রইলে যে তুমি?"

মহারাজের এই দ্বিতীয়বারের প্রশ্নের উত্তরে অজয় বলল—"আমিই যদি পাঠিয়ে থাকি তাতে হয়েছে কি? আমি যে অভিযোগ করছি, আপনি দেখবেন সে অভিযোগ সত্যি কি না।"

—সত্যি হলে কি হবে অজয়?

—আপনি কি তা জানেন না?

—জানি বলেই তো বলছি। তোমার মত নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট মানুষ কি রাজ্য শাসন করতে পারবে?

—আপনি কি তাহলে বলতে চান যে রাজ্য শাসন করতে হলে অশান্ত এবং অশিষ্ট হওয়া দরকার?

—অজয়, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, ভুলে যাচ্ছো বোধ হয়?

—না, ভুলে যাইনি। আমি জানি, সিংহগড়ের মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমি। কিন্তু, রাজ্যের শাসক হলে যে এক চোখো হতে হয় একথাটা আমার এতদিন জানা ছিল না। এবারে জানলাম সে কথাটা।

—অজয়!!

—বলুন তাওজী!

মহারাজা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন—"আমি আজই কলকাতা রওনা হবো। আমার অনুপস্থিতিতে

তুমিই রাজকার্য চালাবে। এখুনি আমি হুকুমনামা সই করছি দরবারে গিয়ে। তুমিও চলো দরবারে।”

—আমি বরং আপনার যাবার ব্যবস্থা করি। ষ্টেশনে খবর পাঠিয়ে গাড়ী রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করতে হবে তো? তাছাড়া বডিগার্ড....

অজয়ের কথায় বাধা দিয়ে মহারাজা বলেন—“না না, ও সব কিছুই করতে হবে না তোমাকে। আমি ছদ্মবেশে যেতে চাই। আমার সঙ্গে থাকবে শুধু বীরবাহাদুর। এখান থেকে মোটরে করে বাইরের কোন ষ্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে টিকিট কেটে যাবো আমরা। তুমি শুধু একখানা সাধারণ মোটর গাড়ী নিয়ে একজন ড্রাইভারকে তৈরী থাকতে বলবে সন্ধ্যা সাতটার সময়।

এই কথা বলেই মহারাজা উঠে পড়লেন দরবারের উদ্দেশে। অজয়ও গেল তাঁর সঙ্গে রাজকীয় হুকুমনামা সইসাবুদ করতে।

॥ চার ॥

সুন্দর একছড়া মালার মত বিছানার ওপর এলিয়ে রয়েছে অঞ্জনার সুন্দর দেহলতাটি। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। অজয় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন খাটের পাশটিতে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ নত হয়ে অঞ্জনার সুন্দর ওষ্ঠপুটে চুম্বন করে সে।

স্বামীর আদর লাভ করে চোখ খুলে মৃদু হেসে বলে—কি খবর? জয় না পরাজয়?'

—জয় পরাজয়ের কথা পরে হচ্ছে, কিন্তু তুমি কি জেগেই ছিলে নাকি?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, আমি মনে করেছিলাম যে, তুমি ঘুমিয়ে আছ।

—তাই বুঝি ঐ সব করা হচ্ছিল?

—কোন সব?

—থাকগে ওসব কথা। এখন বল, খবর কি ওদিকের?

—খবর ভাল নয়।

—তার মানে?

—মহারাজ বিশ্বাস করেননি বিজয়ের বিয়ের কথা।

—কি করে বুঝলে যে, তিনি বিশ্বাস করেননি ওকথা?

—তিনি নিজেই বলেছেন যে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে একেবারেই যে অবিশ্বাস করেছেন, তা কিন্তু মনে হয় না।

—এরকম মনে হবার কারণ?

—কারণ, আজই তিনি কলকাতা রওনা হচ্ছেন। গোপনে যাবেন বলেছেন। সঙ্গে নেবেন শুধু বীরবাহাদুরকে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, আমাকে গাড়া তৈরী রাখতে বলেছেন। সন্ধ্যার পরেই রওনা হবেন তিনি।

—তোমার কি মনে হয় যে, মহারাজ বিজয়ের সম্বন্ধে গোপনে খবরাখবর নিতে চলেছেন ?

—আমার তো তাই মনে হয়।

—আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে।

—কেন বল তো ?

—কারণ, মহারাজা বিজয়কে তোমার চাইতে বেশি ভালবাসেন।

—তাতে কি হয়েছে ?

—তাও বুঝতে পার না হাঁদুরাম! আমার মনে হচ্ছে, বিজয়কে সাবধান করতে, এবং দরকার হলে তার পথ নিষ্কণ্টক করতেই মহারাজার এই গোপন অভিযান।

—আচ্ছা অঞ্জনা, কি দরকার বল তো এই সব ঝঞ্ঝাটে নিজেদের জড়াবার ? এই সিংহাসন পেলে কি আমাদের সুখ বাড়বে ? কি দরকার আমাদের এই সিংহাসনে ? তার চেয়ে বরং চলো আমি আর তুমি....

অজয়ের মুখের কথা টেনে নিয়ে শ্লেষের সুরে অঞ্জনা বলে—হ্যাঁ, আমি আর তুমি কোন অজানা দেশে গিয়ে সুখ-নীড় রচনা করি কোন সমুদ্রের ধারে, যেখানে ভোরের বেলায় বনের পাখিরা ঘুম ভাঙাবে আমরা রোজ সমুদ্রের জলে স্নান করবো এবং দুজনে মুখোমুখী বসে প্রেমের গান গাইব...এই সব কথা বলবে তো তুমি ? তার চেয়ে আমি বলি কি কলকাতা বা বোম্বাইতে গিয়ে কোনও অফিসে একটা কেরাণীর চাকুরী জুটিয়ে নাও তুমি। একখানা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবো দুজনে। তুমি বাজার করবে, আর আমি করবো রান্না। তুমি খেয়ে দেয়ে অফিসে যাবে আর আমি ঘর-দোর পরিষ্কার করে দুপুরে শুয়ে শুয়ে কোন মাসিক পত্রিকা বা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়বো। সত্যিইতো! কি দরকার ওসব রাজ সিংহাসনের ঝুঁকি নিয়ে ?"

অঞ্জনার কথায় আহত হয়ে অজয় বলে—“আমি কি তাই বলছি ?”

—বলেনি, তবে বলতে চেয়েছিলে।

—আচ্ছা অঞ্জনা ! তুমি কি আমার চেয়ে রাজ সিংহাসনকে বেশী ভালবাস ?

—ঐ আবার শুরু করলে তো প্রেমের প্যানপ্যানানি ! কতবার তো তোমাকে বলেছি যে, রসগোল্লা ভালবাসি বলে সন্দেশ আমি ভালবাসিনে, তা নয়। আমি দুটোই চাই।

একটু থেমে অঞ্জনা বলে—“একটা প্রশ্নের সহজ উত্তর দেও ত।”

—কি প্রশ্ন ?

—তুমি কি সিংহাসন চাও না ?

—কে বললে চাই না ?

—তাহলে অতো ভয় কেন তোমার। বিজয় আর তুমি একই বাবা মায়ের যমজ সন্তান। এক ঘণ্টা আগে জন্মেছে বলে শত অন্যায় করেও সে হবে রাজা, আর কোন অন্যায় না করেও তুমি চিরদিন তার কাছে ভৃত্য হয়ে থাকবে, এই কি বলতে চাও তুমি ?

অঞ্জনার এই কথায় ভাবিয়ে তোলে প্রিন্স অজয়কে। সে মনে মনে ভাবে, সত্যই তো, সিংহাসনের ওপর আমার দাবী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কেন আমি পিছিয়ে যাবো ?”

এই সব কথা চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে অজয়। সে বলে—“ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করার ফলে বিজয় সিংহাসনের উত্তরাধিকার হারিয়েছে। এ সিংহাসন আমার। হ্যাঁ, আমারই এ সিংহাসন। এ আমাকে পেতেই হবে !”

অঞ্জনা দেবী খুশ হয়ে ওঠেন স্বামীর কথা শুনে। তিনি বলেন—“এই তো পুরুষের মত কথা ! কিন্তু মনে রেখো, আমাদের সামনে বহু বাধা-বিঘ্ন আসবে। কিন্তু সে সব বাধা-বিঘ্ন দলিত করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। সিংহগড় রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী এখন একমাত্র তুমি।

॥ পাঁচ ॥

যাকে কেন্দ্র করে সিংহগড় রাজ্যের রাজসিংহাসন টলটলায়মান হয়ে উঠেছে সেই সুপ্রিয়া ব্যানার্জির বিষয় বলা হচ্ছে এবার। সুপ্রিয়ার পিতা স্যর বিজন ব্যানার্জী বাংলাদেশের তথা ভারতের একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। কিন্তু ও রকম একজন বিখ্যাত ব্যক্তির কন্যা হয়ে সুপ্রিয়া সিনেমার অভিনেত্রী হলো কেন সে কথা জানতে হলে তার মা-বাপের ভিতরকার সত্যিকারের সম্পর্কিত কথা আগে জানা দরকার।

বিজন ব্যানার্জী তখন কলেজে পড়ে। একদিন সে তার সহপাঠী বন্ধু কমল বসুর আগ্রহাতিশয্যে তাদের গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যায়। কমলের এক ষোড়শী বোন ছিল। নাম তার সন্ধ্যা। সেই বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। সন্ধ্যার সুন্দর চেহারা আর নম্র স্বভাব আকৃষ্ট করে বিজনকে। সন্ধ্যারও ভাল লাগে বিজনকে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। উভয়েই উভয়কে ভালবেসে ফেলে গভীরভাবে।

এরপর থেকে বিজন প্রায়ই আসতে থাকে বন্ধুর বাড়িতে। কমল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। শুধু চুপ করেই থাকে না, প্রকারান্তরে সে প্রশ্রয় দেয় বিজনকে। সে তার কাছ থেকে টাকা নিতে থাকে ধারের নাম করে। স্যর ব্রজেন ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্র বিজনের টাকার অভাব ছিল না। কলেজে আসতো সে নিজের গাড়ি করে। সন্ধ্যায় প্রেমে আত্মহারা হয়ে সে-ও তাই কমলকে টাকা দিয়ে বশীভূত রাখতে চায়।

সন্ধ্যাদের বাড়িতে সে আর তার মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। পাড়ার একটি দুঃস্থ স্ত্রীলোক সারাদিন বাড়ির কাজকর্ম এবং রান্নাবাড়া করে সন্ধ্যা ও তার মাকে খাইয়ে রাত আটটার আগেই নিজের বাড়িতে যেতো। তাই বিজন যখন ওদের বাড়িতে আসতো, তখন তার সঙ্গে

সন্ধ্যার নৈশ মিলনেও কোন বাধা হতো না। সন্ধ্যার মা সব জেনেও না-জানার ভাণ করে থাকতেন। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, প্রতি মাসেই বিজন ওদের বাড়িতে এসে তিন চার দিন থেকে যেতে সুরু করলো।

এদিকে এক বড়লোকের ছেলের ঘন ঘন সন্ধ্যাদের বাড়িতে এসে বাস করায় গ্রামের লোকদের মধ্যে কানাঘুষা সুরু হলো। সেই কানাঘুষা ক্রমে পল্লবিত হতে হতে এমন ঢি ঢি পড়ে গেল যে, একদিন গ্রামের মাতব্বরেরা দল বেঁধে কমলের বাড়িতে এসে হানা দিলেন। তাঁরা সন্ধ্যাকে আর তার মাকে এই বলে শাসিয়ে গেলেন যে, বিজন যদি আর তাদের বাড়িতে আসে তাহলে তাদের সমাজচ্যুত করা হবে এবং বিজনকেও উপযুক্ত সাজা দেওয়া হবে।

ব্যাপার গোলমেলে দেখে কমলের মা সেই দিনই কমলকে চিঠি লিখল অবিলম্বে বাড়িতে আসবার কথা লিখে। কমল এসে তার মায়ের মুখ থেকে সব কথা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সে আর দেরী না করে সেইদিনই কলকাতায় ফিরে গিয়ে বিজনকে সব কথা খুলে বলে।

প্রেমের ব্যাপারে এইভাবে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বিজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে তিনদিনের মধ্যে কলকাতায় একখানা বাড়ি ভাড়া করে কমলকে দিয়ে তার মা আর বোনকে সেই বাড়িতে নিয়ে আসে। বলা-বাহুল্য, কমলও বোডিং ছেড়ে দিয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকে।

এদিকে সন্ধ্যার প্রেমে হাবুডুবু খেলেও লেখাপড়ায় বিজন অবহেলা করতো না। ফলে সে বি. এ. পরীক্ষা ভালভাবেই উত্তীর্ণ হলো।

ছেলে বি. এ. পাশ করবার পর স্যর ব্রজেন তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছেলেকে বিলাতে পাঠাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ চলছে বলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে তিনি চাইলেন না। তিনি তখন উঠে পড়ে লেগে গেলেন ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে। বলাবাহুল্য, স্যর ব্রজেনের ইচ্ছার কথা জেনে কলকাতার

অভিজাত সমাজের মেয়ের বাপ-মায়েরা সচেষ্ট হয়ে উঠলেন বিজনকে জামাই করবার আশায়। একের পর এক গাড়ি আসতে লাগলো স্যর ব্রজেনের বাড়িতে আর সেই সব গাড়ি থেকে নামতে লাগলেন বিশিষ্ট লেডীরা তাঁদের অনুঢ়া মিশিবাবাদের হাত ধরে।

কনের সেই গুল-বাগিচা থেকে সেরা গোলাপের একটি কুঁড়িকে পছন্দ করলেন স্যর ব্রজেন। রূপে, গুণে, কুলে, ধনে, মানে সব দিক থেকেই বিনতা মুখার্জী গ্রহণযোগ্যা। স্যর ব্রজেন কথা দিয়ে দিলেন বিনতার বাবা স্যর সুশীল মুখার্জিকে।

বিজনেরও ভালই লাগলো বিনতাকে। তার মনে হলো, গ্রাম্য মেয়ে সন্ধ্যার সাথে প্রেম করে সে খুবই ভুল করেছে। সুরু হয়ে গেল তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব! একদিকে বিনতা, অন্যদিকে সন্ধ্যা। বিনতা সুন্দরী, বিদুষী, মোটরবিহারিণী, নৃত্যগীত পটীয়সী, আর সন্ধ্যা— ?

বিনতার সঙ্গে তুলনীয় পরীক্ষায় সন্ধ্যা পেলো জিরো নম্বর। তাই সুবোধ বালকের মত পিতৃ-আজ্ঞা পালন করলো বিজন।

এদিকে বিজনের সঙ্গে প্রেমের পরিণতিতে সন্ধ্যা তখন সন্তান-সম্ভবা। এই সময় বিজনের বিয়ের সংবাদ শুনে তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। লজ্জায়, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে সে বিষপান করলো আত্মহত্যা করবার জন্য। কমল বাড়িতেই ছিল সেদিন। সন্ধ্যা বিষ খেয়েছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে ডাক্তার ডেকে আনল। বিজনকেও টেলি-ফোনে সংবাদ দিল তার কৃতকর্মের ফল জানিয়ে। সন্ধ্যা যে ওইভাবে বিষপাক করবে, এ কথা বিজন কল্পনাও করতে পারেনি। তাছাড়া বিনতাকে বিয়ে করলেও সন্ধ্যাকে সে দূরে ঠেলে দিতে চায় নাই। সে তাই টেলিফোন পেয়েই চলে এলো সন্ধ্যার বাড়িতে। ডাক্তারকে বললো, যত টাকা লাগে লাগুক, সন্ধ্যাকে তিনি যেন বাঁচিয়ে তোলেন।

ডাক্তারের চিকিৎসায় সন্ধ্যা বেঁচে গেল। বিজন সন্ধ্যাকে বললো, বাবার আদেশে তাকে বিয়ে করতে হলেও সন্ধ্যা তারই আছে, এবং চিরদিন তারই থাকবে। সে এ কথাও বললো যে, বাবা চিরদিন বেঁচে

থাকবে না। তিনি গত হলেই সন্ধ্যাকে তিনি আইনসম্মতভাবে স্বীকৃতি দিবেন বিবাহ করে।

এই ঘটনার পর অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গার বুকে। স্যার ব্রজেন ব্যানার্জী গত হয়েছেন। পিতার বিশাল সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরাধিকারী হয়েছে বিজন। সদাশয় ইংরেজ সরকারও তার পৈতৃক 'স্যার' উপাধিটি তাকে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। সেদিনের সেই কলেজের ছাত্র বিজন ব্যানার্জী তখন স্যার বিজন ব্যানার্জী, ও. বি. ই.।

সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সামাজিক ভাবে স্বাকৃতি না দিলেও সন্ধ্যার গর্ভজাত কন্যা সুপ্রিয়াকে তিনি ভালবাসেন নিজের মেয়ে মনে করেই। সুপ্রিয়া ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া শিখে বি. এ. পাশ করেছে। কলেজে পড়বার সময় সে ছিল কলেজের সেরা মেয়ে। লেখাপডা, আবৃত্তি, অভিনয়, গান, সবেতেই সে সব সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে! ছেলের দল তার আশেপাশে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত করে বেড়িয়েছে। কিন্তু গরবিণী সুপ্রিয়া তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

কিন্তু সেই গরবিণী সুপ্রিয়ার সমস্ত গর্ব একদিন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যেদিন সে জানতে পাবে যে, স্যার বিজন তার মায়ের আইনসঙ্গত স্বামী নন। সেদিন তার মায়ের শোবার ঘরে কথা হচ্ছিল তার মায়ে সঙ্গে স্যার বিজনের। সুপ্রিয়া বাড়িতে ছিল না। মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে।

সন্ধ্যা বলছিল—"মেয়ে যদি জানতে পারে যে, আমি তোমার সত্যিকারের স্ত্রী না, রক্ষিতা মাত্র, তাহলে ও হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে।"

সুপ্রিয়া একটু আগেই বাড়িতে ফিরেছিল। মাকে কি একটা কথা বলবার জন্য সে মায়ের ঘরের সামনে আসতেই সন্ধ্যার কথাগুলো শুনতে পায় সে। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি কেঁপে

ওঠে। সে ভাবে—"একি নিদারুণ কথা শুনলাম! আমার মা রক্ষিতা? আমি এক রক্ষিতার সন্তান! হায় ভগবান!...."

সন্ধ্যা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। পাগলের মত সে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে স্যর বিজনকে বলে—"আমার জন্মের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জন্য আপনি যত টাকা ব্যয় করেছেন দয়া করে সেই টাকার অঙ্কটা আমাকে বলুন।"

স্যর বিজন অবাক হয়ে যান সুপ্রিয়ার কথা শুনে। তিনি বলেন—"কি বলছো মা?"

—বলছি, আমার জন্য আপনি আজ পর্যন্ত যত টাকা খরচ করেছেন আমি তা পরিশোধ করবো এবং আজই, এই মুহূর্তেই আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাব।

সুপ্রিয়ার কথা শুনে সন্ধ্যা বলল—"তুই কি পাগল হলি নাকি?"

সুপ্রিয়া উত্তর দেয়—"সত্যি আমি পাগল হয়ে গেছি মা। আমি... আমি রক্ষিতার মেয়ে...ওঃ ভগবান!...

এই কথা বলেই দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সুপ্রিয়া।

সন্ধ্যা এবং স্যর বিজন, দুজনেই যেন চোর হয়ে যান সুপ্রিয়ার সামনে। এ অবস্থায় তাঁরা যে কি করবেন তা বুঝেই উঠতে পারেন না। স্যর বিজনের অবস্থাই তখন সবচেয়ে কাহিল। তিনি আর মাথা তুলে তাকাতেও পারছিলেন না সুপ্রিয়ার দিকে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধ্যা বলে—"তুমি এখন যাও। কয়েক দিন এখানে আর এসো না।"

—তাই ভাল, হ্যাঁ তাই ভাল। বলতে বলতে ঘর থেকে অপরাধীর মত পালিয়ে যান স্যার বিজন ব্যানার্জী।

।। ছয় ।।

এরপর ঘটনা এগুতে থাকে নাটকীয় গতিতে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীর পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম অসিত সেন। ইনি ছায়াচিত্র জগতের সুরকার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রিয়ার গান শুনে এবং অভিনয় দেখে তিনি একবার তাকে সিনেমায় অভিনয় করবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর কথায় আমলই দেয়নি সুপ্রিয়া। আজ কিন্তু তাঁর কথাই সর্বাগ্রে মনে হলো সুপ্রিয়ার। তার মনে হলো, অসিত সেনের কাছে গেলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে সিনেমায় অভিনয় করবার সুযোগ দিতে পারবেন।

এই কথা মনে হতেই সুপ্রিয়া অসিত সেনের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সুপ্রিয়াকে দেখে খুসি হয়ে অসিত সেন বলল—"কি ব্যাপার মিস্ ব্যানার্জী! আপনি হঠাৎ কি মনে করে?

—প্রয়োজনের তাগিদে।

—অর্থাৎ?

—আপনি একদিন আমাকে সিনেমায় অভিনয় করবার কথা বলেছিলেন, মনে আছে?

—নিশ্চয় মনে আছে।

—পারেন আমাকে একটা সুযোগ দিতে?

—আপনি কি সত্যিই চান অভিনয় করতে?

—হ্যাঁ চাই।

—বেশ! আমি এখন যে ছবিতে সুরকার হিসেবে কণ্ট্রাক্ট করেছি, সে ছবির হিরোইন এখনও স্থির হয়নি। প্রডিউসার বোম্বে থেকে কোন অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবার কথা বলছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরের ইচ্ছা, কোন শিক্ষিতা এবং সুন্দরী নতুন মেয়েকে চান্স

দেবার। আমার মনে হয়, আপনাকে নিশ্চয়ই তিনি সুযোগ দেবেন। একটু বসুন, আমি এখুনি ফোনে কথা বলছি ডিরেক্টরের সঙ্গে।

এই সময় সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলো—"এ ছবির ডিরেক্টর কে জানতে পারি কি?"

—নিশ্চয়ই পারেন। বিখ্যাত ডিরেক্টর অসীম চ্যাটার্জী এ ছবির ডি:রেক্টর।

—কি বললেন! অসীম চ্যাটার্জী। তিনি তো আমাকে ভালই চেনেন। আমাদের কলেজের একটা অভিনয় অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। আমার অভিনয় দেখে সেদিন খুশিও হয়েছিলেন তিনি।

—ইয়া আল্লা! তব তো মার দিয়া কেল্লা। আচ্ছা দাঁড়ান, এখুনি অসীমবাবুর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করছি।

এই কথা বলেই অসিত সেন টেলিফোন করলেন অসীম চ্যাটার্জীকে। টেলিফোনে সুপ্রিয়ার কথা বলতেই তিনি জানালেন যে, তিনি আজই কণ্ট্রাক্ট করতে চান সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। তিনি আরও জানালেন যে, প্রডিউসার তাঁর বাড়িতেই আছেন। সুপ্রিয়া দেবী যদি আসতে পারেন তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যে কণ্ট্রাক্ট করে যেতে পারেন তাঁর সঙ্গে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে অমিত সেন বললেন—"তাহলে প্রস্তুত হোন সুপ্রিয়া দেবী। এখুনি আমাদের যেতে হবে। আজই, মানে এখন থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করতে চান তিনি।

সেই দিনই কণ্ট্রাক্ট সই করেন সুপ্রিয়া দেবী।

ছবির কাজ সুরু হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই এবং এত দ্রুত গতিতে কাজ চলে যে, মাত্র ছ মাসের মধ্যেই সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত প্রথম ছায়াচিত্র পর্দার বুকে আত্মপ্রকাশ করে।

অনবদ্য অভিনয় করেছিল সুপ্রিয়া সে ছবিতে। তাই দেখতে দেখতে

চিত্রজগতের মহা মহারথীগণ তার কাছে আসতে সুরু করে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তাকে নায়িকার ভূমিকার অভিনয় করবার অনুরোধ নিয়ে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে, সিনেমায় অভিনয় করবার কণ্ট্রাক্ট সই করবার পরদিন থেকেই সুপ্রিয়া তার মায়ের কাছ থেকে চলে যায়। সে বাস করতে থাকে হোটেলে ড্রিমল্যাণ্ডের একটা সুট ভাড়া নিয়ে।

এই হোটেলেই দিলীপ সিংয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় সুপ্রিয়ার। সুন্দর চেহারার এই যুবকটি টাকা ব্যয় করতো যথেচ্ছরূপে। টাকা যেন তার কাছে খোলামকুচি। সুপ্রিয়া লক্ষ্য করলো যে, হোটেলে দিলীপ সিংয়ের খাতির সর্বত্র। এ হেন দিলীপ সিং একদিন উপযাচক হয়ে এসে সুপ্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করলো। কথাপ্রসঙ্গে সে একথাও জানালো যে, সিনেমার ছবি প্রডিউস করতে চায় সে।

এর পর ক্রমে ক্রমে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। সুপ্রিয়াকে নায়িকা করে একখানা ছবিও প্রডিউস করল সে। সুপ্রিয়াকে পার্টনার করে নেয় দিলীপ তার নবজাত প্রডাকশন কোম্পানীর। বলাবাহুল্য, ছবিখানা হিট করে এবং মোটা টাকা লাভ হয় কোম্পানীর। এই প্রডাকশনের ব্যাপারে ওরা আরও ঘনিষ্ঠ হয় এইং সেই ঘনিষ্ঠতাব ফলে উভয়ে উভয়কে ভালবেসে ফেলে।

এই সময় একদিন দিলীপ সুপ্রিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। সুপ্রিয়ারও অনিচ্ছা ছিল না দিলীপকে বিয়ে করতে। কিন্তু তার জন্মের ইতিহাস তাকে বাধা দেয় বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে। সে বলে—"আমার মত একজন অজ্ঞাত কুলশীল মেয়েকে বিয়ে করলে ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি সুখী হতে পারবে না।"

সুপ্রিয়ার কথায় দিলীপ বলে—"তোমার যে পরিচয় আমি জেনেছি

তার চেয়ে বেশি কিছু পরিচয় আমার দরকার নেই। এমনকি তোমার বংশ পরিচয়ও আমি জানতে চাই না।"

সুপ্রিয়া বলে—"আমার জন্মের ইতিহাস যদি মসীলিপ্ত হয় তাহলেও কি রাজী আছ আমাকে বিয়ে করতে?"

—হ্যাঁ, তাহলেও রাজী আছি। আমার কাছে তুমিই সব? তোমার সম্মতি পেলেই আমি সব ব্যবস্থা করতে পারি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না তো?

—হয়তো করবেন কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে যাতে কোন বাধা না আসে সেই ভাবেই কাজ করবো আমি। আমরা রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করবো। এবার বলো, তোমার সম্মতি আছে কিনা?

সুপ্রিয়া বলে—"কবে যেতে চাও নোটিশ দিতে?"

দিলাপ সুপ্রিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে তার গালে একটি চুমু দিয়ে বলে—"আজই"!

এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরেই ম্যারেজ রেজিষ্টারের অফিসে দিলীপ সিংয়ের সঙ্গে সুপ্রিয়া ব্যানার্জীর বিয়ে হয়ে যায় সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট অনুসারে। সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকেন হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার শ্রীমহালিঙ্গম পিলে, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীঅসিত সেন, চিত্র জগতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং কয়েকখানা সিনেমা-পত্রিকার সম্পাদক ও রিপোর্টার।

হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডে সেদিন মহাসমারোহে বান্ধব-বান্ধবী এবং শুভানুধ্যায়ীদের এক ডিনার পার্টিতে আপ্যায়িত করে দিলীপ আর সুপ্রিয়া। সারা ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো অভিনেত্রী সুপ্রিয়া ব্যানার্জীর বিবাহের সংবাদ। পত্রিকার রিপোর্টারেরা দিলীপ

সিংয়ের ছবিও ছাপতে চেয়েছিলেন সুপ্রিয়ার ছবির পাশে, দিলীপের বিশেষ অনুরোধ তারা তার ছবি নেয় না। সারা ভারতের চিত্রামোদী জনসাধারণ সেদিন শুধু এই সংবাদই জানলো যে, চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রিয়া ব্যানার্জী পরিণীতা হলেন চিত্র প্রযোজক দিলীপ সিংয়ের সঙ্গে। এই দিলীপ সিংই যে,সিংহগড়ের যুবরাজ এবং সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সে কথা কেউ জানলো না, এমনকি সুপ্রিয়াও জানলো না সে কথা।

এরপর থেকেই সুরু হলো সুপ্রিয়া আর দিলীপের দাম্পত্য জীবন। উভয়েরই মনে হতে লাগলো, তাদের মত সুখী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। সুপ্রিয়াকে রাত্রে বুকের কাছে টেনে নেবার সময় দিলীপের মনে হতো, সিংহগড়ের রাজ সিংহাসন এর কাছে অনেক তুচ্ছ।

॥ সাত ॥

দিলীপ আর সুপ্রিয়া যখন হাওয়ায় পাখা মেলে দিন কাটাচ্ছে সেই সময় একদিন বেলা প্রায় দশটার সময় মহারাজ নরেন্দ্র সিংজী আর তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর বীরবাহাদুর হাজির হলেন হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর অফিসে।

হোটেলের মহিলা রিসেপশনিষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চান আপনারা ?"

মহারাজ বললেন—"আমরা দিলীপসিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—মিঃ সিংয়ের অর্ডার আছে, কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁর নাম জেনে নিয়ে টেলিফোনে পূর্বাহ্নে অনুমতি নেবার জন্য। দয়া করে আপনার নামটা বলুন।

রিসেপশনিষ্ট-এর কথায় মহারাজা বললেন—"বলুন, তোমার বাবা আর বীরবাহাদুর এসেছে সিংহগড় থেকে। এখুনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক দিলীপ সিংয়ের বাবা জেনে মহিলাটি তটস্থ হয়ে উঠলো। সে বললো—"আপনি দয়া করে একটু বসুন, আমি এখুনি ফোন করছি মিঃ সিংকে। আমাকে হোটেলের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়, তাই যদি কোন অপরাধ করে থাকি তো মার্জনা করবেন।"

মহারাজ বললেন—"না না, আপনার দোষ কি। আপনি বরং তাড়াতাড়ি দিলীপকে ফোন করুন।"

মহিলাটি তখন আর কালবিলম্ব না করে 'ইণ্টার কমুনিকেশন টেলিফোন-এ দিলীপের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। দিলীপের সাড়া পেতেই মহিলা বললো—'সিংহগড় থেকে আপনার বাবা আর মিঃ বীর বাহাদুর এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁরা ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন।"

মিঃ দিলীপ সিং জানায় যে নিজে এসে তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। এখুনি নিচে আসছে সে।

রিসেপশনিষ্ট মহিলা দিলীপের বক্তব্য মহারাজকে বলতেই বললেন—"বেশ, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিলীপ নিচে এসে মহারাজার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করতেই তিনি বললেন—"এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছো কেন?"

দিলীপ বললো—"দয়া করে ওপরে চলুন তাওজী! আমার ঘরে গিয়েই সব কথা হবে।"

দিলীপের ঘরে গিয়ে প্রথমেই মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"তোমার স্ত্রী কোথায়?"

মহারাজার সরাসরি প্রশ্নে বিব্রত হয়ে দিলীপ প্রথমটা কি বলবে বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে বললে—"আমার স্ত্রী, মানে....

তার মুখের কথা টেনে নিয়ে মহারাজ রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—"মানে, তোমার সেই নাচনেয়ালী স্ত্রী। কোথায় সে?"

মহারাজার কথায় আহত হয়ে দিলীপ বললো—'আমার বিবাহিতা স্ত্রীর সম্বন্ধে আরও একটু শালীনতা আশা করেছিলাম আপনার কাছে তাওজী!"

—কি বললে? বিবাহিতা স্ত্রী! সিংহগড় ষ্টেটের যুবরাজের সঙ্গে নাচনেয়ালী অভিনেত্রীর বিয়ে হতে পারে না।

—হতে না পারলেও তা হয়েছে তাওজী। সুপ্রিয়াকে আমি ভালবেসে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি।

—বিয়ে করেছ মানে? গন্ধর্ব মতে নাকি?

—না। সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট অনুসারে যথারীতি রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করেছি।

দিলীপের মুখ থেকে এই কথা শুনে মহারাজ একেবারেই দমে যান। এতক্ষণ তাঁর ধারণা ছিল যে, যুবরাজ হয়তো তার সাময়িক

মোহের বশে কোন অভিনেত্রীকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করছে কিন্তু তাকে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছে শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, নন্দকিশোরের রিপোর্টে কোন ভুল নেই।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেন—"এর পরিণাম কি হবে তা কি তুমি জানো না বিজয় ?"

—জানি তাওজী। সিংহগড়ের রাজসিংহাসনের দাবী আমাকে ছাড়তে হবে এবং আমি তা জেনেই সুপ্রিয়াকে বিয়ে করেছি। রাজসিংহাসনে আমার দরকার নেই।

দিলীপ আর মহারাজার সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল সুপ্রিয়া পাশের ঘরে বসে। সে হঠাৎ এই সময় পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—"অভিনেত্রী পুত্রবধুকে তার শ্বশুরকে প্রণাম করবার অনুমতি দেবেন কি ?"

এই বলেই সে মহারাজার সম্মতির অপেক্ষা না করেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজা বলেন—"বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

সুপ্রিয়া বললো—"কিন্তু তার আগে আমার কিছু নিবেদন আছে আপনার কাছে। আমি জানতাম না যে আমার স্বামী একটি দেশীয় রাজ্যের যুবরাজ। তাছাড়া একথাও আমার জানা ছিল না যে, আমাকে বিয়ে করলে তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এ জানলে আমি নিশ্চয়ই ওঁকে বিয়ে করতাম না। যাই হোক, যা হয়ে গেছে তা তো আর মুছে ফেলবার উপায় নেই। কিন্তু আমার জন্য রাজসিংহাসন থেকে আমার স্বামী বঞ্চিত হবেন তা আমি চাইনে। আমি তাই স্থির করেছি যে, আমি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবো ওঁর সঙ্গে এবং ডাইভোর্সের অর্ডার পেতে যতদিন বিলম্ব হবে ততদিন আমি আলাদা হয়ে থাকবো। আমি আজই, মানে এই মুহূর্তেই এ হোটেল থেকে চলে যাব স্থির করেছি।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে শেষে সে আমায় বললো—"এইবার বলুন, আপনার কি আদেশ!"

সুপ্রিয়ার কথা শুনে মনে মনে খুশি হলেন মহারাজ। তিনি বললেন—তোমার কথা শুনে সন্তুষ্ট হলাম। মনে হচ্ছে তুমি শিক্ষিতা।

এই সময় যুবরাজ দিলীপ ওরফে বিজয় সিং বলে ওঠে—"হ্যাঁ তাওজী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট।"

মহারাজা বিজয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—"বিজয়ের স্ত্রী হিসেবে তুমি অনুপযুক্ত নও, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তোমাকে বিয়ে করার ফলে ওকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই অনিচ্ছাসত্বেও আমি তোমার সঙ্কল্প অনুমোদন করছি।

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ আবার বললেন—"এখন তুমি কোথায় যেতে চাও?"

সুপ্রিয়া বললো—"কোথায় যাব তা এখনও স্থির করিনি। যে কোন একটা হোটেল কিংবা কোন বান্ধবীর বাড়িতেও উঠতে পারি।"

—তুমি কি এখনও সিনেমায় অভিনয় করছো?

—হ্যাঁ করছি। অভিনয় করা আমার পেশা।

—এখন কোন্ ছবিতে অভিনয় করছো?

—চিত্রদীপা প্রডাকশন্-এর "সাগর সঙ্গম" ছবিতে।

—কোথায় সুটিং হচ্ছে ও ছবির?

—টালিগঞ্জের ইন্দ্রালয় ষ্টুডিওতে।

—ছবিতে অভিনয় করে তুমি কত টাকা পাও?

—মাসিক দশ বার হাজার টাকা হবে। কিন্তু এত খবরাখবরে আপনার দরকার কি?

—দরকার একটু ছিল। আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে কিছু টাকা দেব। আমি যদি বিজয়ের তরফ থেকে তোমাকে এক লাখ টাকা দিতে চাই, তুমি কি তা গ্রহণ করবে?

—ক্ষমা করবেন। অভিনেত্রী হলেও আমি দেহজীবিনী নই। একটু থেমে সুপ্রিয়া আবার বলে—"আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। যুবরাজকে বলবেন, তিনি যেন সুযোগমত কোন সময় এসে আমাকে ডাইভোর্স করে যান। আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠবে না।"

এই পর্যন্ত বলেই সুপ্রিয়া পাশের ঘরে চলে যায় এবং তাড়াতাড়ি তার শাড়ী ব্লাউজগুলি গুছাতে সুরু করে এবং দশ মিনিটের মধ্যেই সে তৈরি হয়ে নেয়। সে তখন হোটেলের অফিসে ফোন করে তার জন্য একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বলে এবং একজন চাকরকে তার ঘরে পাঠাতে বলে। এই সব ব্যবস্থা করে সুপ্রিয়া আবার ফিরে আসে বসবার ঘরে।

একটু পরেই হোটেলের একজন চাকর এসে সেলাম করে দাঁড়ায়। সুপ্রিয়া তাকে সঙ্গে করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একটি সুটকেস তুলে দিয়ে বলে—"এটা নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দাও।"

চাকরটির সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়াও বেরিয়ে আসে শোবার ঘর থেকে। বিজয় সিং এবং মহারাজার দিকে তাকিয়ে সে বলে—"আমি চললাম যুবরাজ এবার নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে সিংহাসনে বসতে পারেন।"

এই কথা বলেই সুপ্রিয়া বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

মহারাজ বিস্মিত হয়ে তাকাল তার চলার পথের দিকে। বিজয় মাথা নত করে বসে থাকে অপরাধীর মত।

কারো মুখেই কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করেন মহারাজা। তিনি বলেন—"রাণী হবার উপযুক্ত মেয়ে, কিন্তু কি করবো, কোন উপায় নেই।"

মহারাজার কথায় বিজয় বলে—"উপায় নেই বলছেন কেন তাওজী! সিংহগড় রাজ্যে তো আপনার কথাই আইন। আপনি ইচ্ছে করলেই ও বিধান বদলে ফেলতে পারেন।"

—তা পারি, আর ফলে এক ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ অজয় এবং তার স্ত্রী প্রবলভাবে বাধা দেবে। মন্ত্রীসভার সভ্য

উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই সবদিক চিন্তা করে দেখেছি যে, পথের বাধাকে সরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কি করতে হবে তাও আমি স্থির করে রেখেছি।

—কি করবেন স্থির করেছেন।

—প্রথমে তোমার পথের প্রধান বাধাগুলোকে সরিয়ে ফেলবো। কেমন করে সরাবো সে কথা তোমার জেনে দরকার নেই। তারপর সিংহগড়ে ফিরে গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে গদীতে বসাবার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তুমি যাতে আবার এই রকম কোন অ-কাজ করতে না পার তার জন্য তোমাকে এখন কিছুদিন সিংহগড়ে থাকতে হবে। আগামী কালই তুমি সিংহগড় রওনা হবে। ওখানে অজয়ের ওপর রাজ্যের ভার রয়েছে এখন। সে যদি তোমার বিয়ের কথা জানতে চায় সোজা অস্বীকার করবে। তুমি বলবে—ওটা একেবারেই বাজে এবং মিথ্যা কথা।

একটু থেমে আবার বলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা। তুমি এখন হোটেলের দেনা মিটিয়ে দিয়ে এসো।"

বিজয় বললো—"দেনা মিটিয়ে দেবার জন্য আমাকে নিচে যেতে হবে না। ফোন করলে এখুনি বিল নিয়ে ম্যানেজার নিজেই আসবে।"

—বেশ, তুমি তাহলে এখুনি ফোন করে দাও। আমি দেখে যেতে চাই যে, তুমি হোটেল এখন ছেড়ে দেবে।

মহারাজার নির্দেশে বিজয় হোটেলের ম্যানেজারকে ফোনে ডেকে আগামী কাল পর্যন্ত বিল করে আনতে বলে। আগামী কাল সে হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে একথা ফোনে জানিয়ে দেয় ম্যানেজারকে। উত্তরে ম্যানেজার জানায় যে, দশ মিনিটের মধ্যেই বিল তৈরী করে নিয়ে সে আসছে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বিজয় বলে—"ম্যানেজার দশ মিনিটের মধ্যেই বিল নিয়ে আসছে।"

মহারাজ বলেন—ঠিক আছে। এবার তুমি তোমার পরবার একটি স্যুট বের করে দাও তো আমায়।

—স্যুট! ও আপনার কোন কাজে লাগবে?

—প্রশ্ন করো না বিজয়, যা করতে বলছি তাই কর।

বিজয় তখন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে তার একটা স্যুট বের করে এনে মহারাজার হাতে দেয়। মহারাজ তখন বীরবাহাদুরকে ডেকে স্যুটটি তার হাতে দিয়ে বললেন—"এটা তোমার কাছে রাখ বীরবাহাদুর।"

বীরবাহাদুর বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুটটি মহারাজার হাত থেকে নিয়ে নিজের যায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য, প্রথম থেকেই সে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ মহারাজ এবং যুবরাজের সামনে তার বসবার হুকুম নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলের ম্যানেজার শ্রী পিলে এসে হাজির হলেন বিজয়ের ঘরে।

বিজয় বললে—"বিল এনেছেন?"

শ্রী পিলে 'এই যে' বলে বিলখানা বের করে বিজয়ের হাতে দিতেই মহারাজ বললেন—"বিলখানা আমাকে দাও।"

বিজয় বিলখানা মহারাজের হাতে দিতেই তিনি বিলের টাকাটা একবার দেখে নিলেন। তারপর পকেট থেকে পার্শ বের করে বিলের পুরো টাকা আর বিলখানা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বললেন—"টাকাগুলো গুণে নিয়ে বিলের পিছনে সই করে দিন।"

ম্যানেজার টাকাগুলো গুণে নিয়ে বললো—"পাঁচশ টাকা বেশি রয়েছে এতে।"

মহারাজ বললেন—"হ্যাঁ, ওটা আপনার।"

শ্রী পিলে তার ম্যানেজারী জীবনে এরকম ফালতু টাকা কোন বোর্ডারের কাছে এর আগে পায়নি। সে তাই খুসিতে গদগদ হয়ে বিলের পিছনে সই করে বিলখানা মহারাজার হাতে ফিরিয়ে দিল।

মহারাজা বিলখানা ভাজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—"আচ্ছা, আপনি এখন আসুন, নমস্কার।"

শ্রী পিলে বিজয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললো—"আবার এসে আমার এখানেই উঠবেন মিঃ সিং।

বিজয় বললো—"নিশ্চয়ই"

শ্রী পিলে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বিজয় আবার বললো—"বয়, খানসামা আর বাবুর্চিদের সুবিধা মত আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, আমি তাদের কিছু বকশিস দিতে চাই।"

শ্রী পিলে সম্মতি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ম্যানেজার চলে যাবার পর মহারাজ বললেন—"আমরাও এখন উঠছি বিজয়। কাল আর একবার আসবো আমি। কালই তোমাকে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।"

এই কথা বলেই মহারাজ বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে। বীরবাহাদুর তাঁকে অনুসরণ করলো বিজয়ের সুটটি হাতে নিয়ে।

॥ আট ॥

কলকাতার উদীয়মান ব্যারিস্টার শ্যামল ঘোষাল আর তার স্ত্রী সেদিন সকালে তাঁদের বাড়ির দোতলার ড্রইংরুমে বসে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছে ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে কানে লাগিয়ে শ্যামল বললো—"হ্যালো!"

—কে কথা কইছেন? হ্যাঁ, আমি শ্যামল—কী ব্যাপার, এত সকালে টেলিফোন! কা মনে করে?—কী বললি! মায়া মিত্র নিহত হয়েছেন!—হ্যাঁ আমি বাড়িতেই আছি, চলে আয়। —নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবো।

শ্যামল রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই ইলা বললো—"কী ব্যাপার? কে ফোন করছিল?

—ফোন করছিল রঞ্জন চৌধুরী, মানে, মদীয় বাল্যবন্ধু শ্রীরঞ্জন চৌধুরী। ও বললে যে, গত রাত্রে কে বা কাহারা অভিনেত্রী মায়া মিত্রকে হত্যা করেছে।

—কী সর্ব্বনাশ! প্রেমের ব্যাপার নাকি?

—মেয়েদের তো ঐ একটিই মাত্র ব্যাপার। মনে হয়, সেই রকমই একটা কিছু হবে।

—তা পুলিশে খবর না দিয়ে তোমাকে এ খবর দেবার মানে? তুমি কি আজকাল গোয়েন্দার কাজ সুরু করেছ নাকি?

—না, এখনও করিনি, তবে করলে মন্দ হয় না। ওতে বেশ। রোমাঞ্চ আছে। কোর্টের মামলাগুলো বেশির ভাগই একঘেয়ে।

—তা বেশ, দেখ যদি সেক্সটন ব্লেক টেক হতে পারো।

শ্যামল হেসে বললো—"ব্লেক হতে অসুবিধে আছে।"

—কেন?

—কারণ, তুমি।

—আমি !

—হ্যাঁ তুমি। তুমি আমাকে বিয়ে করেই ঐ বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ পথটি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছ। ব্লেক হতে গেলে চিরকুমার হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। যাই হোক, এ নিয়ে পরে গবেষণা করলেও চলবে, এখন পেয়ালাটার সদ্ব্যবহার করতে দাও। পেয়ালার চা বেচারারা যে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

এই কথা বলেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল শ্যামল। বলাবাহুল্য, ইলার পেয়ালাও 'চুমুকিত' হতে বিলম্বিত হলো না।

চা-পান পর্ব শেষ হতেই সদর দরজায় মোটরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। শ্যামল বললো—"ঐ বুঝি রঞ্জন এলো।"

ইলা বললো—"আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি। এবারে তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে খুনোখুনি করতে থাক।

—খুনোখুনি মানে ?

—মানে, খুনোখুনি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা আর কি ! এই বলেই একটু মিষ্টি হাসি হেসে ইলা প্রস্থান করলো ঘর থেকে এবং ইলার প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দরজা দিয়া প্রবেশ করলো ফিল্ম প্রডিউসার শ্রীরঞ্জন চৌধুরী।

তাকে দেখেই শ্যামল বললো—"আয় রঞ্জন, আমি তোর অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

রঞ্জন একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বললো—"মায়া আমাকে একেবারেই মজিয়ে গেছে ভাই!"

—মজিয়ে গেছে মানে ? কি রকম মজানো ? প্রেমে মজিয়াছে না "আপনি মজিলি শেষে মজালি লঙ্কায়"—সেই রকম মজানো ? তোর বেলায় কোনটা প্রযোজ্য ?

—এই রকম একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়েও তুই পরিহাস করছিস্ ভাই।

—পরিহাস আবার কখন করলাম ? মজানো ব্যাপারটা তো নানা-

রকম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মায়া মিত্র তোর ছবির অভিনেত্রী, চেহারা সুন্দর, বয়স কম—এ অবস্থায় প্রেমে মজানোটাই তো স্বাভাবিক।

—ছাখ্, শ্যাম, তুই ব্যারিষ্টার হয়েছিস বটে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান তোর এখনও হয়নি। আমি নিজে প্রডিউসার হয়ে কখনও অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে পারি?

—আরে তোবা, তোবা। তাও কখনো হয়? ওসব যারা করে তারা প্রডিউসার হতেই চায় না। আমারই ভুল হয়েছে কথাটা বলা।

—ইয়ার্কি রাখ। এখন যা বলি শোন! মায়া বেচারা মারা গেছে এতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু ও একা মরেনি, আমাকেও মেরে গেছে। ছবির চারভাগের তিনভাগ সুটিং হয়ে গেছে, এখন দেখছি পুরো ছবিটাই বাতিল করতে হয়। মায়ার ছিল 'সাইড্ হিরোইন'-এর রোল। আমার প্রায় লাখ টাকা জলে গেল।

—এক পয়সাও জলে যাবে না। আমার কথামত যদি চলতে পারিস, দেখবি, তোর টাকা 'সপ্তপদী' হয়ে ফিরে আসছে।

—'সপ্তপদী' মানে?

—মানে সাত পা। পিপীলিকার থাকে ছয় পা। আর তোর টাকার হবে না ফিরে আসবার সময়। এক টাকা ফিরিবেক সাত টাকা হয়ে। বুঝলি?

—কি বলতে চাস তুই, বল্?

—বলছি, তুই কোন বাঘা সাহিত্যিককে ধর। গল্পটার যে পর্যন্ত সুটিং করা হয়েছে সেই অংশ পর্যন্ত তাঁকে শুনিয়ে দিয়ে বলবি যে, এর পরে হঠাৎ মায়া যার রোল অভিনয় করছিল সেই মেয়েটিকে হঠাৎ মেরে ফেলে দিতে হবে এবং গল্পটার মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যেতে হবে। সাহিত্যিকের কলমের খোঁচায় দেখবি মায়া মরেও তোকে বাঁচিয়ে যাবে।

—কথাটা মন্দ বলিসনি। এটা যে সম্ভব, এ কথাটা একবারও মনে

হয়নি আমার। তোর কথামতই কাজ করবো আমি। কিন্তু ওসব কথা থাক। এখন তোর কাছে কেন এসেছি শোন!

—বল্।

—মায়া হঠাৎ নিহত হবার পেছনে কোন গোপন রহস্য আছে বলে মনে হয়।

—একে রহস্য, তার আবার 'গোপন'। প্রেম-ঘটিত নিশ্চয়ই।

—মোটেই না। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার ওর ছিল না। ও ছিল 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' পর্যায়ের মেয়ে। তাছাড়া আমি যতদূর জানি, ওর কোন শত্রু ছিল না।

—মেনে নিলাম তোর কথা। কিন্তু আমি এ অবস্থায় কি করতে পারি? তুই বরং ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি যদি ব্যাপারটাকে রহস্যজনক বলে মনে করেন, নিশ্চয়ই কোন ডিটেকটিভ্ ইনসপেক্টরকে নির্দেশ দেবেন গোপনে তদন্ত চালাবার জন্য।

—তদন্তের ব্যাপারে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

—মাথাব্যথা নেই, তবে কি পায়ের ব্যথায় এতটা পথ ছুটে এলি?

—আবার সুরু করলি ইয়াকি। নাঃ! তোর সঙ্গে দেখছি কথা বলাই মুস্কিল।

—আচ্ছা বল কি বলতে চাইছিস্!

—আমার মনে হচ্ছে, মায়াকে কেউ ভুল করে হত্যা করেছে।

—তার মানে?

—মানে এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, হত্যাকারী বোধ হয় সুপ্রিয়াকে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু ভুল করে হত্যা করেছে মায়াকে।

—তোর এ রকম সন্দেহের কারণ?

—কারণ আছে বৈকি! আজ দুদিন হলো সুপ্রিয়া তার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমার বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে। গতকাল

সুপ্রিয়া যখন ষ্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরছিল, মায়া এসে তার গাড়িতে বসে। সুপ্রিয়া মায়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে আসে। রাস্তা থেকে মায়ার বাড়ী বেশ কিছুটা দূরে একটা সরু গলির মধ্যে। সে গলিতে গাড়ি ঢোকে না। তাই গলির মোড় থেকেই মায়া নেমে যায়। তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মায়া তাই সুপ্রিয়ার বর্ষাতি কোটটি চেয়ে নিয়ে গায়ে দিয়ে যায়।

তারপর ?

—তারপর, আজ খুব ভোরে মায়ার মা আমাকে ফোন করে জানায় যে, মায়া রাত্রে বাড়িতে ফেরে নাই। একটু পরে সে আবার ফোন করে। এবারে তার স্বর কান্না-মাখানো। সে জানায় যে মায়াকে কে বা কাহারা হত্যা করে বাড়ির দরজার সামনে ফেলে রেখে গেছে। আমাকে সে একবার আসতে অনুরোধ করে। আমি তখন বউবাজার থানায় ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিই তারপর মায়ার বাড়িতে যাই। আমি গিয়ে দেখি সত্যিই মায়া তার বাড়ির সদর দরজার সামনে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে এবং তার গায়ে সুপ্রিয়ার বর্ষাতি।

—বর্ষাতিটা যে সুপ্রিয়ার তা কি করে জানলি তুই ?

—অতি সহজেই, কারণ, সুপ্রিয়া আর আমি গতকাল একই সঙ্গে ষ্টুডিওতে গিয়েছিলাম। কাল সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তাই সুপ্রিয়া একটা সবুজ রঙের বর্ষাতি গায়ে দিয়ে যায়। সেই বর্ষাতিটাই দেখতে পেলাম মায়ার গায়ে। সুপ্রিয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, সত্যিই মায়া তার বর্ষাতিটা চেয়ে নিয়েছিল।

—সুপ্রিয়াকে এ সব কথা বলেছিল ?

—না।

—ভালই করেছিস্। ওকে এখন কিছু না বলাই ভাল।

—আমি এখন কি করবো বল্ তো ?

—তুই সুপ্রিয়ার ওপর নজর রাখবি। এমন ভাবে নজর রাখবি যাতে ও কিছু বুঝতে না পারে। যদি দেখিস, কোন অপরিচিত লোক

ওকে লক্ষ্য করছে, বা ওর ওপরে নজর রাখছে তাহলে সেই লোকের ওপরে বিশেষভাবে নজর রাখবি। আর, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে ফোন করে জানাবি। এখন হাইকোর্ট বন্ধ, আমাকে সব সময় বাড়িতেই পাবি। ইতিমধ্যে আমিও দেখছি কতটা কি করতে পারি।

—বেশ, তোর কথা মতই কাজ হবে। এবার তাহলে আমি উঠি।

রঞ্জনের কথা শেষ হবার আগেই ইলা ঘরে প্রবেশ করে। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"উঠি মানে? চা না খেয়ে যাওয়া হবে না আপনার। বসুন।"

এমন সময় শ্যামলের খানসামা মদন চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকছে।

অতএব বাধ্য হয়েই রঞ্জনকে অপেক্ষা করতে হলো।

মদন ওদের প্রত্যেকের সামনে চা আর একপ্লেট করে পেষ্ট্রী সার্ভ করলো। চা খেতে খেতে ইলা বললো—"বন্ধুকে তো তদন্তের কাজে লাগালেন, আমাকেও একটা কিছুতে লাগিয়ে দিন না এ ব্যাপারে!"

ইলার কথা শুনে শ্যামল বলে—"বেশ তো, স্বামীর সহকারিণী হয়ে তুমিও লেগে যাও না কাজে। তুমি সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার মুখ থেকে কথা বের করে আনতে চেষ্টা করো। স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হল কেন, এবং তার স্বামীর পরিচয় কি ও স্বভাব-চরিত্র কেমন, এসব কথা জানতে পার কিনা দেখ।"

ঠিক বলেছো তো?

—নিশ্চয়ই। আজ থেকে আমি হচ্ছি গোয়েন্দা আর তুমি আমার য্যাসিস্ট্যাণ্ট।

শ্যামলের কথার উত্তরে রঞ্জন বললো—"ঠিকই বলেছে শ্যামল। সহকারী ছাড়া গোয়েন্দারা কাজ করতেই পারে না। তবে কিনা, একটু অসুবিধে হচ্ছে যে, বৌদি রিভলভার চালাতে পারেন না।"

শ্যামল বললো—"কুছ্ পরোয়া নেই। মেয়েদের মুখই রিভলভার।"

তিন জনেই হেসে ওঠে কথা শুনে।

হাস্য-পরিহাসের মধ্যে চা পান শেষ করে রঞ্জন বিদায় নেয়।

॥ নয় ॥

পূর্বোক্ত ঘটনার পরের দিনের কথা।

ইলা এইমাত্র সুপ্রিয়ার বাড়ি থেকে ফিরেছে। তাকে দেখেই শ্যামল জিজ্ঞাসা করলো—"কি গো মিসেস্ য়্যাসিস্ট্যাণ্ট! খবর পেলে কিছু?"

—"নিশ্চয়ই পেয়েছি।" বলে ইলা স্বামীর সামনে একখানা চেয়ারে বসে বললো—"অনেক খবর জোগাড় করে এনেছি তোমার জন্য।"

কি রকম?

—সুপ্রিয়া দেবীর স্বামীর নাম লোকে দিলীপ সিং বলে জানলেও আসলে তার নাম বিজয় সিং। শুধু তাই নয়, এই বিজয় সিং আবার সিংহগড় স্টেটের যুবরাজ এবং রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু একথা আর কাউকে জানাতে নিষেধ করেছে সুপ্রিয়া দেবী।

—তাই নাকি! ব্যাপারটা তো ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে দেখছি।

—হ্যাঁ, কিছুটা জটিল তো বটেই। যাই হোক, পরবর্তী খবরগুলো আগে শুনে নাও।

মহারাজ নরেন্দ্র সিংজীর ছদ্ম পরিচয়ে কলকাতা আসবার কথা, দিলীপ ওরফে বিজয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা, সুপ্রিয়ার হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড থেকে চলে আসা প্রভৃতি সমস্ত কথাই ইলা জানালো তার স্বামীকে।

সব শুনে শ্যামল বললো—"কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি রাজা-মহারাজার ব্যাপার!" যাই হোক, তোমার জোগাড় করা খবরগুলো সত্যিই খুব মূল্যবান। এজন্য তুমি পুরস্কার দাবী করতে পার আমার কাছে।"

—বেশ, তবে দাও পুরস্কার!

—কী পুরস্কার চাই বলো?

—আজ রাত ন'টার শো'তে সিনেমায় যাওয়া।

—মাত্র এইটুকু? আর কোন পুরস্কার চাই কি?

—আমার আর কিছু দাবী নেই, তবে তোমার যদি ইচ্ছা হয় দিতে পার।

—নিশ্চয়ই দেব।

এই বলে শ্যামল চেয়ার থেকে উঠে ইলার গালে ও ঠোঁটের মৃদু একটা চাপ দিয়ে বললো—"এই হলো প্রথম পুরস্কার। দ্বিতীয়টা হবে রাত্রে। তোমার ইচ্ছা মতই।"

ইলা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে—"যাও, তুমি যেন একটা কি! যত বয়স হচ্ছে ততই যেন তুমি বে-সরম হয়ে উঠছো। বয়-খানসামারা কেউ দেখে ফেললে কি ভাবতো বলোতো?"

—কি, আবার ভাবতো। ওরাও ওদের যৌবনকালে বিবিজানদের এমনি ভাবেই আদর করতো। যাই হোক, আমি এবার একটু বের হবো। ইতিমধ্যে রঞ্জন যদি ফোন করে তাহলে তার কাছ থেকে খবরগুলো জেনে নিও।"

—তুমি এখন কোথায় যাবে?

—বউবাজার থানায়। ওখানকার ও. সি-র সঙ্গে দেখা করে পুলিশ কতটা কি করেছে জানতে চেষ্টা করবো।

—আমাকে আর কোন কাজ করতে হবে কি?

—না। তুমি এখন বাড়িতেই থাকবে। রঞ্জনের ফোন আসতে পারে।

—তুমি ফিরবে কখন?

—ঠিক সময়ই ফিরবো। সিনেমায় যাওয়া অবশ্যই হবে।

এই কথা বলেই শ্যামল বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্যামল সোজা চলে গেল বৌবাজার থানায়। ওখানকার অফিসার-ইন্-চার্জ শ্রীপুলকেশ বটব্যালের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল শ্যামলের।

পুলকেশ তাই শ্যামলকে দেখে পুলকিত হয়ে বললো—"কী ব্যাপার মিঃ ঘোষাল! আপনি হঠাৎ থানায়?"

শ্যামল বললো—"থানায় তো লোক হঠাৎ-ই আসে। আগে থেকে ভেবেচিন্তে সাধারণতঃ থানায় আসে না কেউ।

—তা যা বলেছেন, কিন্তু কি ব্যাপার?

—ব্যাপার গুরুতর, অর্থাৎ নরহত্যা।

—নরহত্যা! কোথায়?

—নরহত্যা বলা ঠিক যায় না। ওটা হবে নারীহত্যা। মায়া মিত্রের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমাকে কিছুটা খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে কিছু সূত্রটুত্র পেয়েছেন কি?

—না স্যর, ও ব্যাপারে যতই এগুচ্ছি ততই দেখছি অন্ধকার। আমরা যা প্রমাণ পেয়েছি তা থেকে জানতে পেরেছি যে মায়া মিত্রের কোন শত্রু ছিল না। এমন কি প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীও কেউ ছিল না তার। প্রেম-ট্রেমের ধারই ধারতো না ও।

—আমিও সেই রকমই শুনেছি, যাই হোক, আর কি জানতে পেরেছেন তদন্ত করে?

—জানতে পেরেছি যে ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। পেছন থেকে ফাঁস পরিয়ে অতর্কিতে টানলে যেভাবে লোকে পড়ে যায়, মায়ার মৃতদেহটিও ঠিক সেইভাবে পড়েছিল। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। বিষয়টা হলো, ঐভাবে পিছন থেকে ফাঁস লাগিয়ে নরহত্যা করতে হলেও বিশেষভাবে এবং অনেকদিন ধরে শিক্ষা করতে হয়। এরকম হত্যাকারী ভারতে খুব বেশি নেই। শুনেছি, এ ধরণের দু' একজন লোক উত্তর ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে নাকি আছে। এই ব্যাপারটাই রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের।

শ্যামল বললো—এমনও তো হতে পারে যে, মায়া মিত্রকে কেউ ভুল করে হত্যা করেছে!

—ভুল করে হত্যা করেছে! বলেন কি?

—আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।

—আপনি কি কাউকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন ?

—আসল হত্যাকারা কে, তা বলা কঠিন। তবে এ ব্যাপারে যে মহাত্মা দিলীপ সিংয়ের যোগাযোগ আছে এ রকম একটা সন্দেহ আমার হয়েছে।

—মহাত্মা দিলীপ সিং! তিনি আবার কে

—তাঁকে এখনও চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, তিনি 'হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড'-এর একজন বোর্ডার এইটুকুই এখন পর্যন্ত জেনেছি তাঁর সম্বন্ধে। দিলীপ সিংয়ের আসল পরিচয়টা ইচ্ছা করেই চেপে গেল শ্যামল, তার মনে হলো যে, দিলীপ সিং এক দেশীয় রাজ্যের যুবরাজ এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারি শুনলে দারোগাবাবু হয়তো আর এগুতেই চাইবেন না এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে।

দিলীপ সিং 'হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড'-এর বোর্ডার শুনে পুলকেশ বললো—"একটু বসুন মিঃ ঘোষাল, আমি এখুনি দিলীপ সিংয়ের কুলপঞ্জী জেনে নিচ্ছি হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এ ফোন করে।

এই কথা বলেই পুলকেশ টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডে ফোন করলো। ওদিক থেকে সাড়া আসতেই নিজের পরিচয় দিয়ে পুলকেশ দিলীপ সিংয়ের পরিচয় জানতে চাইলো। পরিচয়ে যা জানা গেল তা হলো—নাম—দিলীপকুমার সিংহ, পিতার নাম মৃত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, পেশা—ব্যবসা, স্থায়ী ঠিকানা—জয়পুর। এ ছাড়া আরও একটা খবর পাওয়া গেল যে, দিলীপ সিং গত পরশুদিন হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

খবরগুলো একখানা কাগজে লিখে নিয়ে পুলকেশ বললো—"পাখি উড়ে গেছে মিঃ ঘোষাল।"

শ্যামল বললো—"তা আমি আপনার চেয়ে আগেই জানতে

পেরেছি। লোকটা দেখছি রীতিমত চতুর। যাই হোক, আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। দিলীপ সিং সম্বন্ধে আর কোন খবর পেলে দয়া করে আমাকে ফোন করে জানাবেন।

এই কথা বলেই থানা থেকে বেরিয়ে গেল শ্যামল।

পরদিন দুপুর বেলা বউবাজার থানা থেকে ফোন এলো শ্যামলের। ও. সি. পুলকেশ বটব্যাল যে খবর দিল তার সারসর্ম এই যে, সেইদিন সকালে দিলীপ সিংয়ের মৃতদেহ গঙ্গা থেকে উদ্ধার করেছে রিভার পুলিশ। মৃতদেহটির মুণ্ড নেই, তা সত্ত্বেও সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি। কারণ, মৃতদেহের পরণে যে স্যুট আছে তার কোটের পকেটে 'ড্রিমল্যাণ্ড' এর দেনা পরিশোধের বিল এবং তার নাম ছাপা কার্ড পাওয়া গেছে। এই থেকে অতি সহজেই বুঝতে পারা গেছে যে, মৃতদেহটি দিলীপ সিং ছাড়া আর কারো নয়।

শ্যামল ফোন ছেড়ে ভাবতে আরম্ভ করলো—ততঃ কিম্!

কয়েক মিনিট চিন্তা করবার পর হঠাৎ তার মনে হলো যে, এটাও একটা সাজানো ব্যাপার হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, দিলীপ সিং অন্য কোন লোককে হত্যা করে, তার একটা স্যুট পরিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলোও হয় তো দিলীপ সিং-ই ঢুকিয়ে দিয়েছে মৃতের কোটের পকেটে।

এই সন্দেহটা তার হয় মৃতদেহের মাথা না থাকায়। মাথা না থাকলে কোন লোককে সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

এই কথা মনে হতেই শ্যামল আর কাল বিলম্ব না করে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় অমরেশ বর্মণ নামে তার এক পরিচিত দর্জীকেও সে তুলে নিল গাড়ীতে। অমরেশকে সে বললো যে, একটা স্যুটের মাপ নিতে হবে তাকে।

দর্জী অমরেশকে নিয়ে শ্যামল সোজা বউবাজার থানার অফিসের বাইরে বসিয়ে রেখে সে ও. সি-র সঙ্গে দেখা করলো। তখন প্রায় ছু'টে। ও. সি. তাকে দেখে বলে উঠলো—আবার কি মনে করে মিঃ ঘোষাল ?

—বিশেষ প্রয়োজনেই আবার আসতে হলো মিঃ বটব্যাল। আমার মনে হচ্ছে, মৃতদেহটি দিলীপ সিংয়ের না হতেও পারে।

—এরকম সন্দেহের কারণ ?

—কারণ, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমি একটু তদন্ত করতে চাই এ ব্যাপারে।

—তদন্ত করতে চান !

—না, না, তদন্ত করবেন আপনিই আমি শুধু সঙ্গে থাকবো। ফোনে আপনি বললেন যে, মৃতদেহের পরণে স্যুট রয়েছে। আমি সেই স্যুটের মাপ আর মৃতদেহের মাপ নিয়ে দেখতে চাই স্যুটটা মৃত ব্যক্তির কি না ? মাপ নেবার জন্য একজন দর্জীও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মৃতদেহটি মর্গে আছে নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ, মর্গেই আছেন তিনি। কিন্তু এই অবেলায় মর্গে গিয়ে মড়া ঘাঁটাঘাঁটি করেছি শুনলে গিন্নী আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

এই কথা নিজের রসিকতায় একটু হেঁ হেঁ করে হেসে নিয়ে ও. সি. আবার বললেন—"বেশ, তা হলে চলুন। আর দেরী করার দরকার নেই।

মর্গ-এ গিয়ে আর এক বিপদ। মৃতদেহের মাপ নিতে হবে শুনে দর্জী অমরেশ বর্মণ বেঁকে বসলো। সে বললো যে, মরা-মানুষের মাপ নেওয়া তার দ্বারা হবে না !

অনেক অনুরোধ উপরোধেও যখন অমরেশকে রাজী করা গেল না,

তখন সবচেয়ে কার্যকরী এবং ফলপ্রদ পন্থারই আশ্রয় নিতে হলো শ্যামলকে।

দশ টাকার দু খানা নোট হাতে দিতেই অমরেশ বর্মণের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ওজর-আপত্তি সব কিছু ভেসে গেল নোট দু' খানা পকেটস্থ হতেই।

মর্গের ডোমের সাহায্যে এবং দারোগা বাবু ও শ্যামলের সামনেই চলতে লাগলো মাপ নেবার কাজ। প্রথমে মৃতদেহের পরণের স্যুটটির মাপ নেওয়া হলো। তার পর নেওয়া হলো মৃতদেহের মাপ। ছাতি, পুট, হাতা, কোমর, সেস্ত ইত্যাদির মাপ নেওয়া হয়ে যাবার পর অমরেশ তার হাতের ফিতেটাকে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে বললো— "এটা দিযে আর জ্যান্ত মানুষের মাপ নেওয়া চলবে না।"

শ্যামল বললো—আপনার মাপ নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে কি ?"

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এইবার তাহলে বলুন, এই স্যুট মৃত ব্যক্তির নিজস্ব স্যুট কি না ?

—না।

অমরেশ বর্মণের এই কথায় ও. সি. বললেন—"কি করে বুঝলেন যে, ওটা মৃতব্যক্তির স্যুট নয়।"

—অতি সহজেই। কোটটির কথাই আগে বলছি। মৃত ব্যক্তির পুট, হাতা এবং বুকের মাপ আর এই কোটের মাপের অনেক তফাৎ। প্যাণ্ট সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। প্যাণ্টের কোমরের মাপের আর মৃতদেহের কোমরের মাপের প্রায় তিন ইঞ্চি তফাৎ। প্যাণ্টটার কোমর প্রায় তিন ইঞ্চি বেশি। এইজন্যই বেল্ট দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে প্যাণ্টটা।

ও. সি. আবার প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু স্যুটটা তো রেডিমেট স্যুটও হতে পারে? রেডিমেড স্যুটের মাপ সব সময় শরীরের মাপের সঙ্গে মেলে না।"

—আমি তা জানি। কিন্তু এটা রেডিমেড্ স্যুট নয়।

—কি করে বুঝলেন?

—খুবই সহজ। এই স্যুটের কোটটির ভিতরের পকেটের ওপরে র‍্যাঙ্কিন কোম্পানীর লেবেল লাগানো আছে। র‍্যাঙ্কিন কোম্পানী কখনও রেডিমেড্ স্যুট বিক্রি করে না।

অমরেশ বর্মনের কথাগুলো রীতিমত ভাবিয়ে তুললো মিঃ বটব্যালকে। সে তখন শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ব্যাপারটা তো বড় গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে মিঃ ঘোষাল!"

শ্যামল বললো—"গোলমেলে তো বটেই রহস্যজনকও। সবচেয়ে বড় রহস্য হলো মৃতদেহটি দিলীপ সিংয়ের নয়।

—এ ব্যাপারে আপনি কি সন্দেহ করেন?

—আমি সন্দেহ করি যে, দিলীপ বা তার কোনও লোক কাউকে হত্যা করে সেই নিহত ব্যক্তির দেহে দিলীপ সিংয়ের একটি স্যুট পরিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মৃতদেহটা যে দিলীপ সিংয়ের এটা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে দিলীপের নাম ছাপা কার্ড এবং ওর নামে টাইপ করা হোটেলের বিলগুলো মৃতব্যক্তির কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের মাথাটাও কেটে ফেলা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যেই। কোন মৃতদেহ সনাক্ত করবার প্রধান উপায়ই হচ্ছে তার মুখ। মাথা কেটে নিলে, মৃতদেহ যে অন্য লোকের তা সহজে কেউ বলতে পারে না।

—এ তো দেখছি বড় ভয়ানক ব্যাপার। এখন তাহলে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে দিলীপ সিংকে খুঁজে বের করতে। তা ছাড়া করোনার কোর্টেও ব্যাপারটা বলা দরকার।

—না, না। করোনারের রায় দিলীপের পক্ষে হলেই আমাদের পক্ষে কাজ করা সহজ হবে। এই ব্যাপারটা আমরা ছাড়া আর কেউ যাতে কিছু না জানতে পারে সেইভাবেই চলতে হবে আমাদের।

এই সময় অমরেশ বর্মনের দিকে তাকিয়ে শ্যামল আবার বললো—

"আমি আশা করি, আপনিও এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন না। আপনার মুখ বন্ধ রাখবার মূল্য হিসেবে আরও একবার টাকা দিচ্ছি আপনাকে। এই বলে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে তা থেকে দশখানা দশ টাকার নোট অমরেশের হাতে দিল।

অমরেশ নোটগুলোকে পকেটস্থ করে বললো—"এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না। আপনাদের মুখে দিলীপ সিংয়ের যে পরিচয় পেলাম, তাতে তো দেখছি, এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলে আমারও বিপদ হতে পারে।

ও সি বললো—"ঠিকই বলেছেন। এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা না কবাই ভাল। কিন্তু আর নয়, এবার বাড়িতে ফেরা যাক।"

এই বলেই তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন।

মিঃ বটব্যাল এবং অমরেশ বর্মনকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে বেলা প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল শ্যামলের। বাড়িতে এসে নিজের ড্রইংরুমে ঢুকতেই সে দেখতে পেলো যে, তার স্ত্রী ইলা তার চেয়ারে বসে আছে। শ্যামল কৌতুকভরে বললো—"কি গো! খবর টবর কিছু আছে না কি?"

—আছে বৈকি।

—একটু আগেই তোমার এক মক্কেল ফোন করেছিলেন।

—মক্কেল! কে সে আক্কেলহীন মক্কেল?

—রায় রাঘবেন্দ্র রাহা বাহাদুর।

—কি বললেন তিনি?

বললেন না কিছুই। তুমি বাড়িতে নেই শুনে "ও" বলে ছেড়ে দিলেন ফোনটা।

—শুধুই 'ও'। তা ভাল। কিন্তু, আমাকে এখন এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে কি?

—কেন পারবো না। তুমি বসো, আমি এখুনি বলে আসছি মদনকে।

—না না, অত তাড়াতাড়ির দরকার নেই। মিনিট পনের পরে পেলেই চলবে। আমি বাথরুমে যাচ্ছি স্নান করতে।

—স্নান করতে! এই অবেলায় স্নান করবে মানে?

—মড়া ঘেটে এসেছি যে!

—মড়া! কার মড়া?

তা সঠিক বলতে পারি না, কারণ, মৃত ভদ্রলোক তাঁর মাথাটি রেখে যাননি দেহের সঙ্গে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, যে মৃতদেহটি ঘেঁটে এলাম, সেটি মুণ্ডহীন।

তোমাকে একটা কথা বলবো?

—আজ্ঞা করুন দেবী!

—ঠাট্টা নয় এ কাজটা তুমি ছেড়ে দাও। ব্যারিস্টারী করতে করতে হঠাৎ গোয়েন্দাগিরি করবার শখ তোমার কেন হ:লো বল তো?

—কাজটা বেশ রোমাঞ্চকর।

—বেশ, তুমি তাহলে বাথরুম থেকে রোমাঞ্চিত হয়ে এসো। আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করতে চললাম।

ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলও উঠে পড়লো জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে যাবার জন্য।

॥ দশ ॥

করোনার কোর্ট।

দর্শকের আসনগুলো প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। দর্শকদের মধ্যে একজন অবাঙালী মহিলাকেও দেখতে পাওয়া গেল। মহিলাটি অপরূপ সুন্দরী। ব্যারিস্টার শ্যামল ঘোষালকেও দেখা গেল দর্শকদের ভিতরে।

আদালতের কাজ আরম্ভ হলো।

প্রথমেই ডাক পড়লো মৃতদেহের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার কল্যাণ দাশগুপ্তর। ডাক্তার দাশগুপ্ত তাঁর সাক্ষ্যে বলে যে, মৃত ব্যক্তির পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল দেখতে পেয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে কোন কারণে জলমগ্ন হবার ফলেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের মস্তকচ্যুতি সম্বন্ধেও তিনি তাঁর অভিমত জানালেন। তিনি বললেন যে, মৃত ব্যক্তির গলায়, যেখানে একদা তার মুণ্ডটি অবস্থিত ছিল, সেখানটাও তিনি পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, কোন শস্ত্রের আঘাতে দেহ থেকে মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। মস্তকটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে কোন ভোঁতা জিনিসের আঘাত লেগে। হয়তো চলমান কোন ষ্টীমারের ঘুর্ণায়মান পাখার ব্লেড-এর আঘাতে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে তার মাথাটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ডাক্তার দাশগুপ্তর সাক্ষ্য শেষ হলে করোনার বললেন—"এবার আমাকে প্রমাণ নিতে হবে মৃতদেহটি কার, সেই সম্বন্ধে।"

এই বলে তদন্তকারী জল-পুলিশের দারোগার দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন—"মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় এ রকম কোন প্রমাণ আছে কি ? .

দারোগা বললো—"আছে ইয়োর অনার। আমি একে একে সাক্ষীদের হাজির করছি আপনার সামনে।"

প্রথমেই তিনি আহ্বান করলেন সুপ্রিয়া দেবীকে।

দারোগা বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয়া দেবী যা বললো তার সারমর্ম হলো, মৃত ব্যক্তির পরণের স্যুট, তার কোটের পকেটে প্রাপ্ত নাম ছাপানো কার্ড এবং হোটেলের বিল দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে মৃতদেহটি তার স্বামী দিলীপ সিংয়ের।

পরবর্তী সাক্ষী 'হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড'-এর ম্যানেজার শ্রীমহালিঙ্গম পিলে বললো যে, মৃত দিলীপ সিং তারই হোটেলের বোর্ডার ছিলেন। মৃতদেহের পরণে যে স্যুট আছে, ওটাও তিনি দিলীপ সিংয়ের স্যুট বলেই ঘোষণা করেন। ঐ স্যুটপরা অবস্থায় তিনি তাকে অনেকবার দেখেছেন। এছাড়া দিলীপ সিং যেদিন র‍্যাঙ্কিন কোম্পানীতে স্যুটটি তৈরীর জন্য অর্ডার দেন, সেদিন সে-ও তার সঙ্গে ছিল। মৃতব্যক্তির কোটের পকেটে হোটেলের যে বিল পাওয়া গেছে, সেখানা যে অকৃত্রিম এ কথাও বলে সে। মর্গে গিয়েও সে সনাক্ত করে দিলীপ সিংয়ের বডি বলে।

শ্রীপিলের পরে যে সাক্ষ্য দিতে আসে জল-পুলিশের এ. এস. আই. শ্রীনরেশ চৌধুরী। সে বলে যে, মৃতদেহটা প্রথমে দেখতে পায় জেলে-ডিঙির একজন মাঝি। তার মুখে খবর শুনেই সে মৃতদেহটি জল থেকে তুলে আনে।

করোনারের প্রশ্নের উত্তরে নরেশ চৌধুরী আরও জানায় যে, দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রায় এক লক্ষ মাইল দক্ষিণে মৃতদেহটি জলে ভাসমান অবস্থায় সে প্রথমে দেখে এবং সেখান থেকেই সে মৃতদেহটি তুলে আনে।

করোনার আবার প্রশ্ন করেন—"মৃত ব্যক্তির মাথাটার জন্য অনুসন্ধান করেছিলেন কি?"

এই প্রশ্নের উত্তরে নরেশ চৌধুরী বলে—"মাথাটি খুঁজে বের করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়েছে। আমার মনে হয়, হাঙ্গর বা ঐ জাতীয় কোন জলজন্তু মাথাটি খেয়ে ফেলেছে।"

নরেশ চৌধুরীর পরে সাক্ষ্য দেয় জল-পুলিশের দারোগা। সে বলে যে, এ. এস. আই. নরেশ চৌধুরী মৃতদেহটি নিয়ে আসবার পর সে নিজে তার দেহ ও পকেটগুলো তল্লাসী করে। তল্লাসীর ফলে পকেট থেকে দিলীপ সিংয়ের নাম ছাপা কার্ড, একটা মানিব্যাগে ভরতি পাঁচ'শ টাকার নোট ও হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড'-এর বিল পায়। সে তখন হোটেলে ড্রিমল্যাণ্ডের ম্যানেজার মিঃ পিলের সঙ্গে দেখা করে দিলীপ সিংয়ের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়। মিঃ পিলে তাকে বলে যে, দিলীপ সিং দুই দিন আগে তার হোটেলের দেনা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বিল এবং কার্ডখানাও সে সনাক্ত করে। মৃতদেহটির সামনে নিয়ে গেলে মৃতব্যক্তির স্যুটটিও সে সনাক্ত করে দিলীপ সিংয়ের স্যুট বলে। দিলীপ সিংয়ের স্ত্রীর নামও সে জানতে পারে শ্রীপিলের মুখ থেকেই। এই মহিলাকে খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হয়নি, কারণ চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী হিসেবে তিনি সুপরিচিতা। তিনি নিজেও এই আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং হিজ অনার তার সাক্ষ্য নিজের কানেই শুনেছেন এবং তাকে দেখেছেন। এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন অজ্ঞাত কারণে জলমগ্ন হয়েই দিলীপ সিংয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং যে মৃতদেহটি পাওয়া গেছে সেটা দিলীপ সিংয়ের মৃতদেহ।

জল-পুলিশের দারোগার সাক্ষ্য শেষ হতেই করোণার তাঁর রায় ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—"আদালতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা এই কথাই সপ্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে জলমগ্ন হবার ফলে দিলীপ সিং নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং যে মৃতদেহটি আদালতে আনা হয়েছে, সেটি যে দিলীপ সিংয়ের এটাও প্রমাণিত হয়েছে। আমি তাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, মৃতদেহটি দিলীপ সিংয়ের এবং জলমগ্ন হবার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।"

করোনারের রায় ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রিয়া দেবী আদালত থেকে বের হয়ে যায়। সুপ্রিয়া দেবী বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তে সেই অবাঙালী মহিলাটি বেরিয়ে যান আদালত থেকে। তাঁর ব্যস্ততা লক্ষ্য

করে শ্যামলের মনে হয় যে, তিনি সুপ্রিয়াকে অনুসরণ করছেন। সম্ভবতঃ তাই সকলের অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে যায় মহিলাটির গতিবিধির প্রতি নজর রাখবার উদ্দেশ্যে।

বাইরে এসে শ্যামল দেখতে পায় যে, সুপ্রিয়া একখানা গাড়িতে উঠে বসছে। সে গাড়িতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িখানা চলতে সুরু করে। শ্যামল আজ লক্ষ্য করে যে, সেই অবাঙালী মহিলাটিও একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সুপ্রিয়ার গাড়িটি অনুসরণ করছে। ট্যাক্সিখানা যে আগে থেকেই ভাড়া করে রাখা হয়েছিল সেকথা বুঝতেও দেরী হয় না শ্যামলের।

সে-ও তখন নিজের গাড়িতে উঠে সেই ট্যাক্সি অনুসরণ করে।

সুপ্রিয়ার গাড়ি চৌরঙ্গী রোড় ও আশুতোষ মুখার্জী রোড পার হয়ে সাদার্ন য্যাভিনিউতে মোড় নেয়। সামনের ট্যাক্সিটিও সাদার্ন য্যাভিনিউতে ঢুকে সুপ্রিয়ার গাড়ি অনুসরণ করতে থাকে। এরপর একসময় সুপ্রিয়ার গাড়িখানা একটা বাড়ির গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। বলাবাহুল্য, বাড়িখানা চিত্র প্রয়োজক রঞ্জন চৌধুরীর।

সুপ্রিয়ার গাড়ি রঞ্জন চৌধুরীর বাড়ির গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতেই ট্যাক্সিখানা সোজা বেরিয়ে গেল। শ্যামল কিন্তু তখনও সেই ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছে। ক্রমে নানা রাস্তা ঘুরে অবশেষে ট্যাক্সিখানা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর এভারেষ্ট হোটেল-এর সামনে এসে থামল।

শ্যামল তখন হোটেল থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে তার গাড়ি থামিয়ে মহিলাটির দিকে নজর রাখলো। সে দেখতে পেলো যে, মহিলাটি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সোজা হোটেলের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

মহিলাটির বাসস্থান দেখে নিয়ে শ্যামল তার গাড়িকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে চললো। তার এখন বার বার মনে হতে লাগলো—"কে এই মহিলা ?"

॥ এগার ॥

করোনার কোর্ট থেকে সুপ্রিয়াকে অনুসরণ করছিল সিংহগড় রাজ্যের যুবরাজ্ঞী অঞ্জনা।

সুপ্রিয়ার বাসস্থান দেখে আসবার পরদিন সকাল আটটায় অঞ্জনা সুপ্রিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলো।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলো—"কাকে চান আপনি ?"

অঞ্জনা বললো—"আপনাকেই।"

—আমাকে ! কি দরকার বলুন ?

—সবই বলছি। তবে আসল কথা বলবার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি সিংহগড় স্টেটের যুবরাজ অজয় সিংহের স্ত্রী, নাম অঞ্জনা দেবী। এবার তাহলে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে, সম্পর্কে আমি আপনার ছোট জা।

সুপ্রিয়া আশ্চর্য হয়ে যায় সিংহগড় স্টেটের যুবরাজ্ঞীকে তার কাছে এসেছে দেখে। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে সে বলে—"আমি তো আপনাদের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছি, তাহলে আবার কেন এসেছেন আমার কাছে ?"

সুপ্রিয়ার কথার উত্তরে অঞ্জনা বলে—"কেন এসেছি একটু পরেই বলছি সে কথা; কিন্তু তার আগে আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই আমি।"

—কি জানতে, বলুন ?

—গতকাল করোনার কোর্টে যে মুণ্ডহীন মৃতদেহটি দেখে এলেন, সেটা কে কি আপনার স্বামীর মৃতদেহ বলে চিনতে পেরেছিলেন ?

—এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে ?

—মানে, মৃতদেহটা আপনার স্বামীর অর্থাৎ যুবরাজ বিজয় সিংহের

নয়। তিনি এখন বহাল তবিয়তে সিংহগড় রাজপ্রাসাদে বিরাজ করছেন।

—বলেন কি!

—ঠিকই বলছি। আপনার এখানে আসবার আগে আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম পেয়েছি। টেলিগ্রামে তিনি জানিয়েছেন যে, যুবরাজ বিজয় সিংহ সিংহগড়ে ফিরে এসেছেন এবং রাজপ্রাসাদে বাস করছেন।

—মৃতদেহটি তাহলে কার?

—কার তা সঠিক বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস যে, ওটা নন্দকিশোর গুপ্ত নামে আমার এক অনুচরের মৃতদেহ। তাকে হত্যা করবার পর যুবরাজের একটি স্যুট পরিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

—কী ভয়ানক কথা! কে হত্যা করলো লোকটাকে?

—মায়া মিত্রকে যে লোক হত্যা করেছে সেই একই লোক করেছে নন্দকিশোরকে। নন্দকিশোর জানতো আপনার সঙ্গে যুবরাজের বিয়ের কথা, তাই পথের কাঁটা মনে করে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মায়া মিত্রকে হত্যা করলো কেন? সে কি করেছে?

—কিছুই করেনি সে। তাকে হত্যা করা হয়েছে ভুল করে। হত্যাকারী আপনাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল।

সুপ্রিয়া আঁতকে ওঠে এই কথা শুনে। ভীতকণ্ঠে সে বলে—"আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল! কী অপরাধ আমার?"

—অপরাধ আবার কি! যুবরাজ বিজয়ের সিংহাসন লাভের পথে আপনি এক মহা অন্তরায়। ওরা তাই আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল।

—ওরা বলতে কাদের বলছেন আপনি?

—আপনার স্বামী এবং সিংহগড়ের বর্তমান অধিপতি হিজ হাইনেস স্যর নরেন্দ্র সিংজী। আমার মনে হয় তাঁকে আপনি দেখেছেন।

হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু আমি তো তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, যুবরাজের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করছি আমি, তা সত্ত্বেও আমার ওপর ওঁর অতো আক্রোশ কেন?

—আক্রোশ কেন বুঝতে পারছেন না? তিনি মনে করেন যে, আপনি জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে আবার হয়তো বিষয়টা জানাজানি হবে, আপনাকে জীবিত রাখাটা বিজয়ের স্বার্থের প্রতিকূল বিবেচনা করেই আপনাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমার সন্দেহ যে, মহারাজার বিশ্বস্ত অনুচর বীরবাহাদুরকেই দেওয়া হয়েছিল ও-কাজের ভার এবং বীরবাহাদুর ভুল করে হত্যা করেছে মায়া মিত্রকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার জীবনটাও নিরাপদ নয়।

—আপনি কি আমাকে এইসব কথা বলে সাবধান করতে এসেছেন?

—না, অতোটা নিঃস্বার্থ পরোপকারী মনে করবেন না আমাকে। আমি আপনার কাছে এসেছি নিজের স্বার্থে।

—ব্যাপারটা খুলে বলুন।

—বেশ, খুলেই বলছি সব। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, যুবরাজ বিজয় সিংহ যদি সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে পরবর্তী অধিকারী হবেন আমার স্বামী। আমি তাই আপনার কাছে এসেছি আপনার সাহায্য-প্রার্থিনী হয়ে।

—আপনাকে সাহায্য করে আমার লাভ?

—লাভ এই যে, ভবিষ্যতের জন্য আপনার জীবন হবে নিরাপদ। তাছাড়া আমাকে সাহায্য করলে আপনাকে আমি দশ লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত।

—আমি খুব দুঃখিত অঞ্জনাদেবী। আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে আমি রাজী নই।

—রাজী হওয়া না হওয়া আপনার অভিরুচি। কিন্তু একটা কথা

ভেবে দেখুন যে, আমাকে সাহায্য করলে যুবরাজ বিজয় সিংহাসন হারাবেন এবং সিংহাসন হারাবার পর আর আপনাকে হত্যা করবার প্রয়োজন থাকবে না। অন্যদিকে, আমাকে যদি সাহায্য করতে রাজী হন, তখন আমার স্বামীর সিংহাসন লাভের আগে আমি আপনাকে নিরাপদে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

—আপনার প্রতিশ্রুতির মূল্য কি? আপনার নিজের অনুচরকেও তো রক্ষা করতে পারেননি আপনি।

—সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত। আমি আগে ভাবতেই পারিনি যে ওরা নন্দকিশোরকে হত্যা করবে। যদি আমার এরকম সন্দেহ হতো তাহলে ওরা কিছুতেই তাকে হত্যা করতে পারতো না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি সচেতন। তাই আমার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখতে পারেন আপনি।

—আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি তাতেই বা ফল কি হবে। মহারাজকে তো আর সিংহাসনচ্যুত করা যাবে না। মহারাজ যদি সিংহাসন না ছাড়েন এবং তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে আপনাকে, আমাকে এবং আরও যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদের হত্যা করেন, তাহলে কি করতে পারবেন আপনি?

—আপনার কথা ঠিক হতো যদি মহারাজা গদীতে থাকতে পারতেন। আপনি হয়তো জানেন না যে, ষ্টেটের বিধান অনুসারে মহারাজার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করলেই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য। আজ থেকে আর মাত্র দশদিন বাকি আছে তার পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করতে। এর আগেই যে কোন একজন যুবরাজকে অভিষেক করতে হবে রাজতক্তে। তাহলে বুঝতে পারছেন যে, অনির্দিষ্ট কাল আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

—আমি রাজী আছি আপনাকে সাহায্য করতে। এবার আমাকে কি করতে হবে বলুন।

—এখানে আপনাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু যে কোন মুহূর্তে

সিংহগড় রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আমি এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—আমার সঙ্গে যদি আমার দুজন বন্ধু যেতে চান তাতে কি আপনার আপত্তি আছে ?

—কে কে যাবেন আপনার সঙ্গে ?

—একজন হলেন আমার একাগ্র বিশ্বাসভাজন বন্ধু শ্রীরঞ্জন চৌধুরী যার বাড়িতে আমি বাস করছি। আর একজন কে যাবেন, তা এখুনি বলতে পারছি না।

—বেশ, নিয়ে যাবেন তাঁদের। তবে লোকসংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল, কারণ আরও দুটি লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।

—আর দুজন কে কে ?

—একজন হলেন রেজিস্টার অব ম্যারেজ, যাঁর অফিসে আপনার সঙ্গে যুবরাজের বিয়ে রেজেষ্ট্রি হয়েছিল এবং অন্যজন হলেন হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার, যিনি আপনাদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন।

—আমি যে বন্ধুর কথা বলছি, তিনিও সাক্ষী ছিলেন আমাদের বিয়েতে।

—তাহলে তো ভালই হবে। বেশ, আপনার বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তৈরী হয়ে থাকবেন।

আগামী কাল রওনা হবো আমরা।

এই বলে সুপ্রিয়ার কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নেয় অঞ্জনা।

॥ বারো ॥

এবার শ্যামলের খবর নেওয়া যাক।

মায়ার হত্যা রহস্যের সূত্র ধরে যতই সে এগুচ্ছে ততই যেন নতুন নতুন ঘটনা এসে বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলছে। ইলার কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে যে দিলীপ সিং সিংহগড় রাজ্যের যুবরাজ। কিন্তু দিলীপের কলকাতায় থেকে উধাও হওয়া এবং অন্য একজনের মৃতদেহকে দিলীপ সিং বলে প্রমাণ করবার চেষ্টার পিছনে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে বলে মনে হলো শ্যামলের। সে তাই স্থির করলো যে, ম্যারেজ রেজিষ্টার অফিসে গিয়ে সুপ্রিয়া আর দিলাপ সিংয়ের বিয়েতে কে কে সাক্ষী ছিলেন তাদের নাম ঠিকানাগুলো সংগ্রহ করবে। সাক্ষীদের মধ্যে দিলীপের কোন না কোন বন্ধুর নাম ঠিকানা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই কথা মনে হতেই শ্যামল পি. কে. রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, ম্যারেজ রেজিষ্টার মিঃ রায় রেজিষ্টার হিসাবে কাজ করেন ফাউ হিসাবে। আসলে তিনি একজন ব্যবসাদার। অনেকগুলো কোম্পানার সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসটি তার নিজের বাড়িতেই রেখেছেন। সরকারের কাছ থেকে এজন্য তিনি টাকা পান। মিঃ রায় শ্যামলকে আগে থেকেই চেনেন। তাই শ্যামলকে দেখে তিনি বললেন—"কি ব্যাপার মিঃ ঘোষাল। আপনি এখানে কি মনে করে?"

—বিশেষ কোন প্রয়োজনেই আপনার কাছে আসতে হয়েছে মিঃ রায়!

—কি প্রয়োজন, বলুন?

—আপনার রেকর্ড থেকে দিলীপ সিং আর সুপ্রিয়া ব্যানার্জীর বিয়েতে যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাঁদের নাম ঠিকানাগুলো আমাকে দিন।

—কি আশ্চর্য! ওদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দেখছি অনুসন্ধানের শেষ নেই।

—কি রকম?

—এই তো তিন চার দিন হলো এক অবাঙালী মহিলা এসে ওদের বিয়ের রেকর্ডের সার্টিফায়েড কপি নিয়ে গেলেন। তার আগেও সার্টিফায়েড কপি নিয়েছেন এক ভদ্রলোক।

—ওদের নাম ঠিকানাগুলো পাওয়া যাবে কি?

—নিশ্চয়ই যাবে। সার্টিফায়েড কপি যাঁরা নেন, তাঁদের নাম ঠিকানা লিখে রেখে দেওয়া হয়।

—তাহলে দয়া করে ওদের নাম ঠিকানাগুলো আমাকে দিন।

রেজিষ্টার তখন তাঁর অফিসের এক কেরাণী বাবুকে ডেকে বললেন—"অভিনেত্রী সুপ্রিয়া ব্যানার্জী আর দিলীপ সিংয়ের বিয়ের রেকর্ডের সার্টিফায়েড কপি যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের নাম ঠিকানাগুলো একখানা কাগজে লিখে আনুন তো হেমন্ত বাবু।"

একটু পরেই হেমন্তবাবু একখানা কাগজ এনে রেজিষ্টারের হাতে দেয়। রেজিষ্টার কাগজখানার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেখানা শ্যামলের সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলেন—"এই নিন তাঁদের নাম ঠিকানা।"

শ্যামল কাগজখানার ওপরে দৃষ্টিপাত করতেই দেখে সেখানে দুজন লোকের নাম ঠিকানা লেখা আছে। প্রথম নামটি হলো শ্রীনন্দকিশোর গুপ্ত, ঠিকানা হোটেল এভারেস্ট, কলিকাতা, এবং দ্বিতীয় নামটি হলো—অঞ্জনা দেবী। তাঁরও ঠিকানা—হোটেল এভারেস্ট, কলিকাতা।

শ্যামল সেই কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ওদের বিয়ের সাক্ষীদের নাম ঠিকানাগুলো জানাতে অনুরোধ করে রেজিষ্ট্রারকে। রেজিষ্ট্রার তখন একখানা মোটা বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে একটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুলে বলেন—"লিখে নিন মিঃ ঘোষাল, আমি সাক্ষীদের নামগুলো বলছি।"

শ্যামল তার নোট বই আর কলম বের করে প্রস্তুত হতেই রেজিষ্ট্রার বলতে সুরু করলেন—"শ্রীমহালিঙ্গম পিলে, ম্যানেজার, হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড; শ্রীরতন চৌধুরী, চৌধুরী লজ, সাদার্ন য়্যাভিনিউ, শ্রীঅমিত সেন, ৪নং মোহন বাগান ষ্ট্রীট ও শ্রীসুবিনয় বসু, সম্পাদক চিত্রদীপা; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

বাইরে আসতে আসতে শ্যামল ভাবলো—"এভারেস্ট হোটেলে থাকে নন্দকিশোর! মর্গ থেকে যে মহিলাকে অনুসরণ করেছিলাম, তিনিও ঐ হোটেলেই গিয়েছিলেন। মনে হয় ঐ মহিলার নামই অঞ্জনা দেবী। কে এরা?....

এই কথা মনে হতেই শ্যামল তার গাড়ি এভারেস্ট হোটেল অভিমুখে চালিয়ে দিল।

হোটেলের অফিস কক্ষে যেতেই ম্যানেজার তখন জিজ্ঞাসা করলো—"কাকে চান আপনি?"

শ্যামল বললো—"আমি শ্রীনন্দকিশোর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—নন্দকিশোর বাবু তো নেই এখানে!

—নেই মানে? এখানেই তো তিনি থাকেন বলে জানি।

—জানেন ঠিকই, তবে এখন তিনি নেই। সাত আট দিন হলো তিনি দেশে গেছেন।

—কোন্ তারিখে গেছেন বলবেন কি?

শ্যামলের ক্রমাগত প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে ম্যানেজার বলে—"অতো শতো বলতে পারবো না মশাই। বলছি তিনি নেই, তা একেবারে জেরা সুরু করে দিলেন।

ম্যানেজারের কথা শুনে শ্যামল বুঝলো যে, সে আর বেশি কিছু বলতে চায় না। সে তাই চালাকী খাটিয়ে বললো—"নন্দকিশোর বাবু নিহত হয়েছেন এ সংবাদটা চেপে যাচ্ছেন আপনি। আপনার হোটেলেই তিনি নিহত হন এ খবরও আপনার অজানা থাকবার কথা

নয়। অথচ আপনি বলছেন সাত আট দিন আগে তিনি দেশে গেছেন। ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত সুরু হয়েছে জানেন ?

ম্যানেজার ঘাবড়ে গিয়ে বলে—"বলেন কি মশাই! নন্দকিশোর বাবু নিহত হয়েছেন ? সত্যি বলছি, তিনি এখান থেকে চলে যাবার পর তাঁর সম্বন্ধে আর কোন খবরই জানিনে।"

শ্যামল বুঝতে পারলো যে ঔষধ ধরেছে। সে তাই ভারিক্কি চালে চললো—"আমি সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার, আপনি যদি নন্দকিশোর-বাবুর সম্বন্ধে সব কথা আমাকে জানান তাহলে আপনাকে যাতে এ মামলায় জড়ানো না হয় সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করবো।"

ম্যানেজার বললো—কি জানতে চান, বলুন ?

—নন্দকিশোর সম্বন্ধে যা কিছু আপনি জানেন, সব কথা খুলে বলুন আমাকে।

শ্যামলের কথায় ম্যানেজার বললো—"নন্দকিশোর বাবু প্রায় সাত আট মাস এই হোটেলে আছেন। ওঁর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল বলেই জানতাম। তবে, চালচলনে কেমন যেন পাগলাটে ভাব।"

—কি রকম ?

—মানে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতেন তিনি। কখনও পুরী, কখনও দার্জিলিং, কখনও রাঁচি চলে যেতেন উনি কাউকে কিছু না বলে; এমন কি জামা-কাপড় না নিয়েও তিনি সাত আট দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছেন অনেকবার।

—উনি কি করতেন জানেন ?

—কাজ একটা কিছু নিশ্চয়ই করতেন, তবে কি কাজ তা বলা কঠিন।

—ওঁর নামে কোন চিত্র আসতো না ?

—তা আসতো বৈ কি! প্রতি সপ্তাতেই তিন চারখানা চিঠি আসতো ওঁর নামে। তাছাড়া টেলিগ্রামও আসতো মাঝে মাঝে।

—কোথা থেকে আসতো জানেন ?

—জানি। চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম, সবই আসতো সিংহগড় স্টেট থেকে।

—আচ্ছা ওঁর বয়স কত?

—বোধ হয় সাতাশ আটাশ হবে।

—গড়ন কেমন?

—মাঝারী। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মত হবে।

—ওঁর শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন কোনদিন?

—না, তবে ওঁর উপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল।

—এবারে বলুন, ঠিক কোন তারিখে উনি হোটেল থেকে চলে গেছেন?

শ্যামলের এই কথায় ম্যানেজার একখানা খাতা বের করে তা থেকে দেখে একটা তারিখ বললো। শ্যামল সেই তারিখটা তার নোট বইতে টুকে নিয়ে বললো—"আপনাকে আরও একটা প্রশ্ন করবো।"

—কি প্রশ্ন?

—অঞ্জনা দেবী নামে যে ভদ্রমহিলা এখানে আছেন, তিনি কোথা থেকে এসেছেন?

—তাঁর খবরের কি দরকার আপনার?

—বুঝতে পেরেছি স্যর, ওঁর এই মামলার সংস্রবেই খোঁজ করছেন আপনি।

—কি করে বুঝলেন?

—অতি সহজেই, উনিও সিংহগড় থেকে এসেছেন এবং এখানে এসেই উনি নন্দকিশোরবাবুর খোঁজ নিয়েছিলেন।

—আপনি তো খুব বুদ্ধিমান লোক দেখছি। যাই হোক, আমি যে ওঁর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছি এ কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কানে না যায়। মনে রাখবেন, আপনি গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করতে বাধ্য।

—তা কি আর জানি না স্যার? যাই হোক, কি জানতে চান ওঁর সম্বন্ধে বলুন?

—উনি এখানে কতদিন আছেন?

—সপ্তাহখানেকের বেশি নয়।

—উনি এসে নন্দকিশোরবাবুর খোঁজ করেছিলেন বললেন না?

—হ্যাঁ, উনি এখানে এসে প্রথমেই নন্দকিশোরবাবুর খোঁজ করেন। কিন্তু তিনি নেই শুনে আর কিছু বললেন না। শুধু কবে থেকে তিনি নেই সেই কথাটা জেনে নিলেন।

—তারপর?

—তারপর থেকে উনি এখানেই আছেন।

—ওর সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ আছেন কি?

—না।

—এখানে কতদিন থাকবেন বলেছেন?

—দিন পনের।

অঞ্জনাদেবীর কথা বাদ দিয়ে শ্যামল আবার নন্দকিশোরের কথায় ফিরে আসে।

সে বলে—"আচ্ছা, নন্দকিশোরবাবু কি ঘর ছেড়ে দিয়ে গেছেন?

—না।

—কি বলে গেছেন তিনি?

—বলে গেছেন যে হঠাৎ দেশে যাবার দরকার হওয়ায় কয়েক দিনের জন্য সিংহগড়ে যাচ্ছেন তিনি।

—যাবার আগে কোন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি?

—হ্যাঁ, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসেছিলেন।

—তিনি কে তা জানেন কি?

—না। তবে, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার পরেই নন্দকিশোরবাবু আমাকে ঐ কথা বলে বের হয়ে যান।

—তিনি কি বাক্স-বিছানা নিয়ে গিয়েছিলেন?

—না। তিনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বের হয়ে যাবার পর আর ফিরে আসেননি।

এই পর্যন্ত জেনে নিয়ে শ্যামল হোটেলের ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

বাড়ীতে ফিরে এসেই শ্যামল দেখতে পায় যে, রঞ্জন চৌধুরী তার অপেক্ষায় বসে আছে।

শ্যামলকে দেখে সে বলে—"এই যে ঘোষাল সাহেব! কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

শ্যামল বললো—"কোথায় যাই নাই তাই বরং জিজ্ঞেস করতে পারিস। এমন ভূতের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিস, যার ফলে আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার মত হয়েছে। আমি এখন পুলিশ অফিসারের মত অপরাধীর সন্ধানে স্থানে অস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

—আর তোকে ঘুরতে হবে না ভাই। ব্যাপারটা সবই জানতে পেরেছি আমরা।

—আমরা মানে?

—মানে, আমি আর সুপ্রিয়া। মায়া মিত্রের হত্যাকারী কে, তাও জানতে পেরেছি।

—তাই নাকি! কে সেই মহাপুরুষ?

—মহাপুরুষই বটেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আমাদের পুলিশের নেই। তিনি হচ্ছেন সিংহগড় স্টেট-এর অধিপতি হিজ হাইনেস স্যার নরেন্দ্র সিংজী।

—বলিস্ কি! স্যর নরেন্দ্র সিংজী মায়া মিত্রের হত্যাকারী?

—না, হত্যাকারী ঠিক তিনি নন। আসল হত্যাকারী হলো বীরবাহাদুর নামে তাঁরই এক অনুচর। কিন্তু সে মহারাজার নির্দেশ মতই ওকাজ করেছে।

—এ সব খবর কি করে জোগাড় করলি?

—কষ্ট করে জোগাড় করিনি। খবর নিজেই এনেছিলেন।

—হেঁয়ালি রেখে খুলে বল ব্যাপারটা।

—বলছি শোন। সিংহগড় রাজ্যের যুবরাজ্ঞী অঞ্জনা দেবী এসেছিলেন সুপ্রিয়ার কাছে।

এরপর অঞ্জনার সঙ্গে সুপ্রিয়ার কথাবার্তার বিবরণ শ্যামলকে জানিয়ে দিয়ে রঞ্জন বলে—"সুপ্রিয়া আমাকে যেতে বলছে ওর সঙ্গে, তুই কি বলিস?"

রঞ্জনের কাছ থেকে সব কথা শুনবার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলের কাছে। এক মিনিট চিন্তা করে সে বলে—"আমি যদি তোদের সঙ্গে যেতে চাই, তাহলে কি অঞ্জনাদেবী আপত্তি করবেন?"

—না, তাঁর আপত্তি হবে না। সুপ্রিয়া আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে যে, তার সঙ্গে তুজন বন্ধু যাবে। কিন্তু যদি যেতে চাস্ তাহলে আব দেরী নয়। এখুনি তৈয়ী হয়ে আমার সঙ্গে চল্। আজই রওনা হতে হবে আমাদের।

রঞ্জনের কথা শুনে শ্যামল বললো—"তুই তাহলে একটু বোস, আমি তৈরী হয়ে আসছি।"

এই কথা বলেই শ্যামল বাড়ীর ভিতর চলে গেল এবং পনের মিনিটের মধ্যেই একটা সুটকেশ হাতে করে ফিরে এসে বললো— বিছানা নিতে হবে নাকি রে?"

—"না, আমার বিছানাতেই তুজনের কুলিয়ে যাবে।"

—তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক, চল।

—বৌদিকে বলে এসেছিস তো?

—নিশ্চয়ই। তাকে বলে এলাম যে, সুপ্রিয়া ও দিলীপ নাটকের শেষ দৃশ্যের সুটিং দেখতে সিংহগড়ে যাচ্ছি, ফিরতে তু'চার দিন দেরী হতে পারে।

শ্যামলের কথা শুনে রঞ্জন বললো—"তাহলে চল", আর দেরী নয়।

নিচে নেমে এসে রঞ্জনের গাড়িতে উঠে বসলো তুজনে। গাড়ি ছুটলো সাদার্ণ য়্যাভিনিউ অভিমুখে।

॥ তেরো ॥

রঞ্জন চৌধুরী যখন শ্যামলের বাড়িতে বসে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, ঠিক সেই সময় অঞ্জনা দেবীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মিঃ পি. কে. রায়ের।

অঞ্জনা বলছিল—"সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম মিঃ রায়। বিয়ের সাক্ষীদের মধ্যে একজনকে সুপ্রিয়া দেবী সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলেছেন। আর একজন প্রধান সাক্ষ্য হলেন হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডের ম্যানেজার মিঃ পিলে। তিনিও রাজী হয়েছেন আমাকে সাহায্য করতে। এবার দয়া করে বলুন আপনি রাজী আছেন কিনা!"

অঞ্জনাদেবীর কথায় মিঃ রায় বললেন—"হোটেলের ম্যানেজারকে কত টাকায় রাজী করলেন, বলবেন কি?"

বুদ্ধিমতী অঞ্জনার বুঝতে দেরী হলো না মিঃ রায়ের কথা।

সে বললো—"মিঃ পিলেকে, আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব বলেছি।"

মিঃ রায় বললেন—"আমার সাহায্য কিন্তু অত কম টাকায় কেনা যাবে না অঞ্জনাদেবী। আপনার এ কাজে আমার প্রাণের ভয়ও আছে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আপনি?"

—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিঃ রায়। আপনাদের রক্ষা করবার সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব।

—আপনার দায়িত্বের মূল্য কতটুকু? রাজা যেখানে আপনার বিরুদ্ধে সেখানে আপনার কথায় নির্ভর করা চলে কি?

—আপনি বলতে কি চাইছেন খুলেই বলুন মিঃ রায়!

—খুলেই বলছি অঞ্জনা দেবী। ম্যারেজ রেজিষ্টার হলেও আমি ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসায়ের মূল কথাই হলো 'গিভ্ য়্যাণ্ড টেক'। আপনি যদি বিশহাজার টাকা দিতে রাজী থাকেন, তাহলেই শুধু একাজে মাথা দিতে পারি।

—বেশ, বিশ হাজার টাকাই দেব আপনাকে।

—কিন্তু তার গ্যারাণ্টি কি অঞ্জনাদেবী! এমনও তো হতে পারে যে, শেষ মুহূর্তে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। আমি টাকাটা অগ্রিম চাই।

—বেশ, তাই হবে! এক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ হাজার টাকা পাবেন আপনি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজই রওনা হতে হবে আমাদের।

—কখন রওনা হতে হবে?

—রাত আটটায় ট্রেন। তার অন্ততঃ পনের মিনিট আগেই ষ্টেশনে যেতে হবে।

—আমি কোথায় অপেক্ষা করবো?

—এখানেই থাকবেন। টাকা নিয়ে ফিরে আসতে আমার এক ঘণ্টার বেশি দেরী হবে না। তার মানে, চারটের মধ্যেই আমি আসছি। আপনি এর মধ্যে তৈরী হয়ে থাকবেন।

—বেশ, তাই হবে। আপনি তাহলে আসুন। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

অঞ্জনাদেবী তখন মিঃ রায়ের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল তার হোটেলে। প্রথমেই হোটেলের অফিসে গিয়ে ম্যানেজারকে বললে—"আমি আজই চলে যাচ্ছি, আপনি বিল তৈরী করে দশ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন।"

ম্যানেজার বললো—"চলে যাবেন কেন ম্যাডাম, এখানে কি কোন অসুবিধে হচ্ছে? আমাদের সার্ভিসের যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, দয়া করে বলুন, আমি এখুনি তার প্রতিকার করছি।"

—না, সার্ভিসে কোন ত্রুটি নেই। আমি আজ দেশে যাব।

—দেশে যাবেন! বেশ, আমি এখুনি বিল তৈরী করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ম্যাডাম, আবার যদি কখনও কলকাতা আসেন তাহলে দয়া করে এখানেই উঠবেন তো?

অঞ্জনা হেসে ফেললো ম্যানেজারের কথা শুনে। সে বললে—হ্যাঁ, এই হোটেলেই উঠবো এসে। কিন্তু আমার এখন কথা বলবার মত সময়

নেই। আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি চলে যাব।

ম্যানেজার বললো—"আপনি তো এই সময় কফি খান। কফি কি ঘরেই পাঠিয়ে দেব?"

—বেশ, তাই দিন।

এই কথা বলেই অঞ্জনা বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে প্রথমেই সে স্যুটকেশ খুলে একটা হাজার টাকার নোটের তাড়া বের করে তা থেকে কুড়িখানা নোট বের করে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখলো অঞ্জনা। এরপর কয়েকখানা একশ টাকার নোট এবং এক বাণ্ডিল দশ টাকার নোটও বের করে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখলো।

টাকা বের করা হয়ে গেলে সে নিজের জিনিসপত্র ও কাপড়জামা স্যুটকেশ-এ ভরতি করে ফেললো। দশ মিনিটের মধ্যেই এসব কাজ হয়ে গেল তার। এরপর সে হাওড়া ষ্টেশনে ফোন করে একটা ফাষ্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করতে বললো তার গন্তব্য ষ্টেশনের নাম উল্লেখ করে। সে আরও জানালো যে, ট্রেন ছাড়বার আধঘণ্টা আগেই সে টাকা দিয়ে দেবে।

ট্রেনের কামরা রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করে ফোন ছেড়ে দিতেই দরজার বাইরে থেকে কড়া নাড়বার আওয়াজ শোনা গেল। অঞ্জনা দরজাটা খুলে দিতেই কফি আর কাজুবাদামের প্লেট সাজানো ট্রে নিয়ে প্রবেশ করলো একটি খানসামা।

অঞ্জনা কখানা এক'শ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললো—"এই টাকা তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিও। আমি আজই চলে যাচ্ছি।"

টাকা পেয়ে খানসামা লম্বা সেলাম করে বললো—"আজই চলে যাবেন মাইজী? আবার যদি কোলকাতা আসেন তাহলে আমাদের কথা মনে রাখবেন দয়া করে।"

অঞ্জনা বললো—"সে কথা আর বলতে হবে না গফুর। তোমাদের সার্ভিসে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আচ্ছা, তুমি এখন যাও ম্যানেজারকে বলো বিলটা এখুনি পাঠিয়ে দিতে। আর, মিনিট পনের পরে এসে ট্রেটা নিয়ে যেও।"

খানসামা আর একবার সেলাম দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খানসামা চলে যেতেই অঞ্জনা কফির পেয়ালায় চুমুক দিল।

অঞ্জনার কফি খাওয়া হয়ে যেতেই দরজায় ম্যানেজারের গলার আওয়াজ পেলো। ম্যানেজার বললো—"ভিতরে আসতে পারি কি?"

অঞ্জনা বললো—"আসুন।"

ম্যানেজার ভিতরে ঢুকতেই আবার বললো—"বিল এনেছেন?"

—হ্যাঁ, এই যে!

—এই বলেই পকেট থেকে বিল বের করে অঞ্জনা দেবীর হাতে দিল ম্যানেজার। বিলের টাকার অঙ্কটা একবার দেখে নিয়ে অঞ্জনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তক্ষুনি পরিশোধ করে দিল সব টাকা।

ম্যানেজার বললো—"বিলটা একবার দিন ম্যাডাম, ষ্ট্যাম্পের ওপরে টাকা পেলাম বলে সই করে দিচ্ছি।"

অঞ্জনা বিলখানা ম্যানেজারের হাতে দিতেই সে বিলের পিছনে রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের উপরে 'সব টাকা বুঝে পেলাম' লিখে নাম সই করে আবার বিলখানা ফিরিয়ে দিল অঞ্জনাদেবীকে।

অঞ্জনাদেবী বললেন—"আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন, নমস্কার।"

ম্যানেজার প্রতি নমস্কার করে চলে যাবার জন্যে দাঁড়াতেই অঞ্জনা আবার বললো—"একটি বয়কে পাঠিয়ে দিবেন বিছানাটা হোল্ড-অল-এ গুটিয়ে বেঁধে দিতে, আর একখানা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাবেন কাউকে।"

ম্যানেজার বললো—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ম্যানেজার চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই একটি বয় এসে হাজির হলো অঞ্জনার ঘরে।

অঞ্জনা বললো—"আমার বিছানাটা হোল্ড-অল-এ গুছিয়ে বেঁধে দাওতো ভাই ?"

বয়টি বিনা বাক্যব্যয়ে অঞ্জনাদেবীর বিছানাটি হোল্ড-অলে গুছিয়ে বেঁধে ফেললো। বাঁধা হয়ে গেলে বয় বলল—"আর কি কবতে হবে দিদিমণি ?"

—আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। শুধু ট্যাক্সি এলে বিছানা আর সুটকেশটা নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দেবে।

অঞ্জনার কথা শেষ হতে না হতেই আর একটি বয় এসে জানালো যে, ট্যাক্সি ডেকে আনা হয়েছে।

অঞ্জনা তখন ওদের দুজনকে সুটকেস দুটো আর বিছানাটা ট্যাক্সিতে দিয়ে আসতে বললো। বয়রা সুটকেস ও বিছানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অঞ্জনাও বেরিয়ে পড়লো তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

নির্দিষ্ট সময়েব মিনিট কয়েক আগেই অঞ্জনা মিঃ রায়ের অফিসে গিয়ে হাজির হলো। মিঃ রায় একটা ছোট্ট বেডিং আর একটা ব্যাগ নিয়ে অঞ্জনা দেবীর অপেক্ষাতেই ছিলেন। অঞ্জনাদেবী আসতেই তিনি বললেন—"টাকাটা এনেছেন কি ?"

অঞ্জনাদেবী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কুড়িখানা হাজার টাকার নোট মিঃ রায়কে দিয়ে বললো—"এই নিন আপনার টাকা।"

নোটগুলো খুলে দেখে মিঃ রায় বললেন—"এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।"

এই কথা বলেই মিঃ রায় বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে দেখলেন যে, অঞ্জনাদেবী ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছেন।

মিঃ রায় তখন তাঁর অফিসের বয়কে ডেকে তাঁর বিছানা ও ব্যাগটাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে বলে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন।

মিঃ রায় ট্যাক্সিতে উঠে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বয় এসে তাঁর ব্যাগ ও বিছানাটা দিয়ে গেল।

অঞ্জনা তখন ড্রাইভারকে বললো—"এবার সাদার্ণ য়্যাভিনিউ চলো।"

সাদার্ণ য়্যাভিনিউতে সুপ্রিয়া দেবীর ঘরে তখন অপেক্ষা করছিল সুপ্রিয়া দেবী, রঞ্জন চৌধুরী আর শ্যামল। অঞ্জনাদেবী আসতেই সুপ্রিয়া বললো—"একটু বসে যাবেন না? এখন তো সবে সাড়ে চারটে।"

অঞ্জনাদেবী বললো—"এখানে না বসে চলুন বরং হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডএই বসা যাবে কিছুক্ষণ।

—ওখানে কেন? প্রশ্ন করলো সুপ্রিয়া।

অঞ্জনাদেবী বললো—"হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডে-এর" ম্যানেজার মিঃ পিলেও যাবেন যে আমাদের সঙ্গে। তাছাড়া ম্যারেজ রেজিষ্টার মিঃ রায় নিচে ট্যাক্সিতে বসে আছেন। ওকে নিচে বসিয়ে রেখে আমার পক্ষে এখানে অপেক্ষা করাটা ভাল দেখায় না। যাই হোক্ আপনারা কে কে যাচ্ছেন?"

সুপ্রিয়া বললো—"এখানে যে তিনজনকে দেখছেন, এই তিন-জনই যাচ্ছি আমরা।"

এই সময় হঠাৎ সুপ্রিয়ার মনে হয় যে, ব্যারিস্টার মিঃ শ্যামলের সঙ্গে অঞ্জনার পরিচয় নেই। সে তাই অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলে—"আপনার সঙ্গে মিঃ ঘোষালের পরিচয় নেই নিশ্চয়ই?"

অঞ্জনাদেবী বললো—"না, সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি।"

সুপ্রিয়া তখন উভয়কে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বললো—ইনি মিঃ শ্যামল ঘোষাল, বার-য়্যাট্-ল, আর ইনি সিংহগড় ষ্টেটের যুবরাণী, অঞ্জনাদেবী।

শ্যামল যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে বললো—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত হলাম।"

প্রতি নমস্কার করে অঞ্জনাদেবী বললো—"আমিও আনন্দিত হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।"

শ্যামল আবার বললো—"সিংহগড়ে গিয়ে আমরা উঠবো কোথায়?"

অঞ্জনা বললো—"সেজন্য আপনাদের মোটেই চিন্তিত হতে হবে না। আমার স্বামী সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখবেন আগে থেকেই। আপনাদের নামতে হবে সিংহগড়ের দুই ষ্টেশন আগে। ওখান থেকে আমার লোক আপনাদের সঙ্গে করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে।"

এই সময় রঞ্জন চৌধুরী বললো—"আপনার লোক আমাদের চিনবে কি করে?"

অঞ্জনাদেবী বললো—"আমিই চিনিয়ে দেব। সে নির্দিষ্ট ষ্টেশনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সুপ্রিয়াদেবী বললো—"তাহলে আর দেরী করে লাভ কি। রঞ্জনবাবু, আপনার ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলুন।"

রঞ্জন বললো—"গাড়ি এবং ড্রাইভার প্রস্তুত হয়েই আছে। আমাদের বিছানা সুটকেশও আগেই গাড়িতে তুলে দেওয়া আছে। এখন শুধু বেরিয়ে পড়লেই হয়।"

অঞ্জনাদেবী বললো—"বেশ, তাহলে দেরী করে দরকার নেই চলুন"

এই সময় সুপ্রিয়া দেবী বললো—"ট্রেনে একটা ফার্ষ্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করলে ভাল হতো।"

অঞ্জনাদেবী বললো—"সে ব্যবস্থা আগেই করা হয়ে গেছে। একটা ফার্ষ্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করেছি আমি।"

শ্যামল বললো—"তাহলে তো দেখছি সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছেন। এবার তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক্।"

এই কথা বলেই শ্যামল উঠে দাঁড়ায়। অন্যান্যরাও উঠে দাঁড়ায় শ্যামলের দেখাদেখি এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ওরা নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসে। সুপ্রিয়াদেবী, রঞ্জন আর শ্যামল ওঠে রঞ্জনের গাড়িতে আর অঞ্জনা ওঠে তার ট্যাক্সিতে।

একটু পরেই গাড়ি দু'খানা চলতে সুরু করে। এবার ওদের গন্তব্যস্থল হলো হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড।

হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার মিঃ পিলে-ও আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। তাই অঞ্জনা দেবী সদলবলে তার হোটেলে হাজির হতেই সে বললো—"আমি প্রস্তুত ম্যাডাম।"

অঞ্জনা বললো—"ধন্যবাদ! একটু পরেই আমরা রওনা হবো। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নিলে মন্দ হতো না।"

মিঃ পিলে বললো—"কি খেতে চান এখন?"

অঞ্জনা বললো—"চা আর লাইট রিফ্রেশমেণ্ট। এই ধরুন, দুখানা করে ফাউল কাটলেট বা ঐ রকম আর কিছু!"

মিঃ পিলে বললে—"চলুন, তাহলে ভিতরের লন-এ গিয়ে বসি। খাওয়া যাবে।"

মিঃ পিলের প্রস্তাব মত সবাই গিয়ে লন-এ বসলো। মিঃ পিলে একজন বয়কে ডেকে আদেশ দিলেন—"ছয় জনের মত চা আর ফাউল কাটলেট নিয়ে এসো।"

পনের মিনিটের মধ্যেই ছয়জন খানসামা ছয়খানা ট্রেতে করে ফাউল কাটলেট, স্যালাড্, মাস্টার্ড, ভিনিগার, সস্ ইত্যাদি সাজিয়ে এনে প্রত্যেকের টেবিলে সার্ভ করে গেল। প্লেট, ছুরি, কাঁটা চামচা আগেই দিয়ে গিয়েছিল একটি বয় এসে।

তিনখানা করে কাটলেট সার্ভ করা হয়েছিল প্রত্যেককে। কাটলেট খাওয়া শেষ হতেই চা এসে গেল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে চা পান করলো সবাই মিলে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে প্রায় সাড়ে ছটা বাজলো। বললো—"আর দেরী নয় মিঃ পিলে, বিছানা স্যুটকেশ ট্যাক্সিতে তুলে দিন।"

মিঃ পিলে বললে—"সে অনেক আগেই হয়ে গেছে।"

মিঃ পিলের কথা শুনে রঞ্জন দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"আসুন তাহলে আর দেরী করে দরকার নেই।"

অঞ্জনার কথায় সবাই উঠে পড়লো এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

॥ চোদ্দ ॥

সিংহগড় রাজপ্রাসাদের যুবরাজ অজয়ের বসবার ঘরখানা বিশেষ-ভাবে সাজানো হয়েছে সে দিন। একদিকে পাতা রয়েছে ছুখানা মহামূল্য চেয়ার। সেই চেয়ার ছুখানার পাশে একটু সামনের দিকে রয়েছে ছুখানা সোফা। সোফা ছুখানায় বসে আছে যুবরাজ অজয় এবং তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা দেবী। ছুজনের মুখই খুব গম্ভীর। তাদের আসন থেকে কিছুটা দূরে পূর্বোক্ত মহামূল্য চেয়ার ছুখানার ঠিক সামনা-সামনি পাতা রয়েছে আরও কয়েকখানা চেয়ার।

এই ঘরের সংলগ্ন ঘরটির দরজাটা খোলা। একখানা পুরু পর্দা ঝুলছে সেখানে। পর্দাটা এত পুরু যে, ঘরের ভিতরে কি আছে কিছুই দেখা যায় না।

পাশের সেই ঘরে অপেক্ষা করছে সুপ্রিয়া দেবী, চিত্র প্রযোজক রতন চৌধুরী, ব্যারিষ্টার শ্যামল ঘোষাল, হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার পিলে এবং ম্যারেজ রেজিষ্টার মিঃ পি. কে. রায়।

একটু পরেই মহারাজা নরেন্দ্র সিংজী এবং যুবরাজ বিজয় প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। যুবরাজ অজয় ও অঞ্জনা দেবী দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করলেন তাঁদের।

মহারাজা অজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—"হঠাৎ কি এমন জরুরী ব্যাপার ঘটছে যে আমাদের আসা দরকার হয়ে পড়লো?"

প্রশ্নটা তিনি অজয়কে করলেও উত্তর দিল অঞ্জনা দেবী। সে বললো—"একটা গুরুতর বিষয় বলবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি পিতাজী।"

—কি এমন গুরুতর ব্যাপার, বলো!

—বলছি পিতাজী, আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

মহারাজা এবং যুবরাজ বিজয় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসবার পর অঞ্জনা দেবী শুধু বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললো—"আগামীকাল আপনার রাজ্যাভিষেক, তাই না ?"

বিজয় বললো—"সে কথা কি তোমার জানা নেই নাকি ?"

—জানা থাকলেও আর একবার শুনতে চাইছি আপনার মুখ থেকে।

—আমি এ রকম বাঁকা কথা শুনতে অভ্যস্ত নই অঞ্জনা। কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো!

—স্পষ্ট করে বলবার জন্যই তো ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে। আমি বলতে চাই যে সিংহগড়ের গদিতে বসবার অধিকার আপনার নেই। অভিনেত্রী সুপ্রিয়া ব্যানার্জীকে বিয়ে করে আপনি অধিকার হারিয়েছেন।

—যত সব বাজে কথা। তোমার এই সব বাজে কথা শুনবার মত সময় আমাদের নেই।

এই বলে মহারাজার দিকে তাকিয়ে বিজয় আবার বললো—"চলুন তাওজী, এদের বাজে কথা শুনে কোন লাভ নেই।"

যুবরাজ বিজয়ের কথায় অঞ্জনা বললো—"আমাদের অনুমতি ছাড়া আপনারা এ ঘরের বাইরে যেতে পারবেন না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

অঞ্জনার কথা শুনে মহারাজা তার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন "তোমার স্পর্ধা দেখছি গগণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বেশ, তাহলে দেখ, আমাকে আটকাবার মত সাহস কারো আছে কিনা!"

এই বলে তিনি সদম্ভে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পান যে, দরজার সামনে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে।

মহারাজা এগিয়ে যেতেই ষোলটি রাইফেল তাঁর দিকে উদ্যত হলো। প্রহরীদের ভিতর থেকে একজন বললো—"প্রিন্স অজয়ের অনুমতি ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না।"

ক্রোধে এবং অপমানে চোখ মুখ লাল করে মহারাজা আবার ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন। অজয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—"আমাদের কি তুমি বন্দী করতে চাও?"

অজয় বললো—"তাওজী। আপনাকে বন্দী করবার মত হীনতা আমাদের নেই। আমরা আপনার কাছ থেকে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছি।"

—কি রকম?

মহারাজার প্রশ্নের উত্তর দেয় অঞ্জনা দেবী। সে বলে—"রকমটা যে কি তা তো আপনি ভাল করেই জানেন পিতাজী। যুবরাজ বিজয় সিংকে গদীতে বসাবার জন্য আপনি নরহত্য করতেও কুণ্ঠিত হননি।

—মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা কথা!

—মোটেই মিথ্যা কথা নয় পিতাজী। সুপ্রিয়া এবং নন্দকিশোর গুপ্তকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। হয়তো আপনি মনে করেছেন যে, যুবরাজ বিজয়ের পথের কাঁটা দূর করতে পেরেছেন। কিন্তু আপনি জানেন না যে, সুপ্রিয়া মনে করে বীরবাহাদুর যাকে হত্যা করেছে, সে সুপ্রিয়া দেবী নয়, তার নাম মায়া মিত্র।

এই সময় যুবরাজ বিজয় বলে ওঠে—"কী পাগলের মত যা তা সুরু করেছ অঞ্জনা। যা খুশি একটা কিছু বললেই তো হবে না। প্রমাণ চাই।

—যুবরাজ যদি মনে করে থাকেন যে সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় না করেই আমি এসব কথা বলছি তাহলে তিনি ভুল করবেন। প্রমাণ এখনই পাবেন আপনারা।

এই বলে পর্দার পাশে গিয়ে সে বললো—"সুপ্রিয়া দেবী একবার এ ঘরে আসুন তো!"

একটু পরেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে সুপ্রিয়া।

তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যুবরাজ বিজয় বলে ওঠে—"একি! তুমি এখানে?"

সুপ্রিয়া বলে—"হ্যাঁ, আমিই। মারা যাইনি।"

অঞ্জনা বলে—"যুবরাজ তাহলে চিনতে পেরেছেন তাঁর স্ত্রীকে!"

অঞ্জনার কথার উত্তরে যুবরাজ বললো—"একে আমি চিনি। কিন্তু এ যে আমার স্ত্রী তার প্রমাণ কি?"

অঞ্জনাদেবী বলে—"ব্যস্ত হবেন না যুবরাজ। সব প্রমাণই পাবেন একে একে।"

এই বলে ম্যারেজ রেজিষ্টারের সই করা দিলীপ সিং আর সুপ্রিয়ার বিয়ের সার্টিফিকেটের একখানা প্রত্যয়িত নকল ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করে মহারাজার হাতে দিয়ে বলে—"পড়ে দেখুন পিতাজী।"

মহারাজা কাগজখানা পড়ে দেখে বলেন—"এতো দেখছি দিলীপ সিং আর সুপ্রিয়া ব্যানার্জীর বিয়ের সার্টিফিকেট-এর নকল। এর সঙ্গে বিজয়ের কি সম্পর্ক?"

অঞ্জনা বললো—"সম্পর্ক যে কি তা আপনি ভালই জানেন। নন্দকিশোরকে হত্যা করে তার মৃতদেহে দিলীপ সিংয়ের সুট পরিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যদি ভেবে থাকেন যে, সুপ্রিয়ার স্বামী দিলীপ সিং বেঁচে নাই বলে প্রমাণ হয়ে গেছে, তাহলে খুবই ভুল করবেন। আমি এখুনি প্রমাণ করবো যে, দিলীপ সিং আর যুবরাজ বিজয় একই ব্যক্তি।"

এই বলে পর্দার কাছে গিয়ে সে আবার বলে—"আপনারা সবাই দয়া করে এ ঘরে আসুন।"

অঞ্জনা দেবীর আহ্বানে পর্দা সরিয়ে একে একে প্রবেশ করলো রঞ্জন চৌধুরী, ব্যারিস্টার শ্যামল ঘোষাল, হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এর ম্যানেজার মিঃ পিলে এবং ম্যারেজ রেজিষ্টার মিঃ পি. কে. রায়।

তাঁদের সবাইকে পূর্বোক্ত চেয়ারগুলিতে বসিয়ে অঞ্জনা আবার তার নিজের যায়গায় ফিরে আসে। সে যেন এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল আজ।

মহারাজার দিকে তাকিয়ে সে বলে—একটু আগেই আপনি বলেছেন যে, বিয়ের সার্টিফিকেটের নকল দেখে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে

যুবরাজ বিজয় সিং সুপ্রিয়া ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছিল। এবার আমি তার অকাট্য প্রমাণ চাই।

এই বলে মিঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"আপনি একটু এগিয়ে আসুন তো মিঃ রায়।"

মিঃ রায় চেয়ার থেকে উঠে কিছুটা এগিয়ে এসে বলল—"কি জানতে চান, বলুন?"

অঞ্জনা তখন মহারাজার হাত থেকে বিয়ের সার্টিফিকেটের নকলটা নিয়ে মিঃ রায়ের হাতে দিয়ে বলে—এই সার্টিফিকেটের কপিতে যাদের বিয়ের কথা উল্লেখ আছে, তাদের বিয়ে কি আপনার সামনে হয়েছে?"

—হ্যাঁ, ম্যারেজ রেজিষ্টার হিসেবে আমিই রেজিষ্ট্রি করেছি এই বিবাহ।

—বর এবং কনে এখানে উপস্থিত আছেন কি?

—হ্যাঁ আছেন।

—দয়া করে তাঁদের দেখিয়ে দিবেন কি?

—নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ রায় তখন যুবরাজ বিজয় সিং এবং সুপ্রিয়া দেবীকে সানাক্ত করেন বর এবং কনে রূপে।

সানক্ত করা হয়ে গেলে অঞ্জনা দেবী বলল—"আপনি এবার আসন গ্রহণ করুন।"

মিঃ রায় আসন গ্রহণ করলে অঞ্জনা আহ্বান করে হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডের ম্যানেজার মিঃ পিলেকে।

মিঃ পিলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালে অঞ্জনা দেবী বলে—"সামনের ঐ যুবকটিকে আপনি চেনেন কি?"

মিঃ পিলে বলল—"নিশ্চয়ই চিনি। আমার হোটেলে ইনি দিলীপ সিং নামে নিজের পরিচয় দিয়ে বাস করছিলেন।"

—ওঁর সঙ্গে সুপ্রিয়া দেবীর বিয়ে হয়েছে সে কথা জানেন কি?

—নিশ্চয়ই জানি, আমি সে বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম।

—আচ্ছা, করোনার কোর্টে একটি মৃতদেহ দিলীপ সিংয়ের বলে সনাক্ত করেছিলেন কি?

—মৃতদেহ দিলীপ সিংয়ের একথা আমি বলিনি। আমি বলছিলাম যে, মৃতদেহের পরণে যে স্যুটটি রয়েছে সেটা দিলীপ সিংয়ের, তাছাড়া সেই স্যুটের কোটের পকেটে যে কার্ড এবং হোটেলের বিল পাওয়া গিয়েছিল সেখানাও আমি সনাক্ত করি।

—এবার তাহলে বুঝতে পারছেন যে, দিলীপ সিং মরে নাই।

—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। এবং বুঝতে পেরে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি।

—আচ্ছা, আপনি এবার আসন গ্রহণ করুন।

মিঃ পিল্লে ফিরে গিয়ে আসন গ্রহণ করতেই আদেশ করলো রঞ্জন চৌধুরীকে।

রঞ্জন এগিয়ে আসতেই অঞ্জনা দেবী তাকে প্রশ্ন করলো—"আপনি কি দিলীপ সিং আর সুপ্রিয়া দেবীর বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন?"

—হ্যাঁ।

—দিলীপ সিংকে আপনি চেনেন কি?

—নিশ্চয় ভাল চিনি। ঐ তো তিনি আমার সঙ্গেই বসে আছেন।

আপনি এবার আসন গ্রহণ করুন, আমার আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই।

রঞ্জন চৌধুরী আসন গ্রহণ করবার পর অঞ্জনা ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলে—"আরও প্রমাণ দরকার হবে কি পিতাজী?"

একটু থেমে অঞ্জনা আবার বললো—"এবার আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমার প্রথম বক্তব্য হলো—"যুবরাজ বিজয় সিং সুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করে রাজ সিংহাসন পাবার দাবী হারিয়েছেন। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হলো—"যুবরাজ বিজয় সিংকে সিংহাসনে বসবার জন্য আপনি আপনার বিশ্বস্ত অনুচর বীরবাহাদুরের সহযোগিতায় দুটি নর-হত্যা করেছেন। আপনারই আদেশে সেই ঘৃণ্য অপরাধ দুটি সংঘটিত হয়েছে। অতএব আপনিই হত্যাকারী।" আমার তৃতীয় বক্তব্য

হচ্ছে, নন্দকিশোর গুপ্তকে হত্যা করে তার মৃতদেহে যুবরাজের স্যুট পরিয়ে দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সুপ্রিয়া দেবীর স্বামী দিলীপ সিং জলে ডুবে মারা গেছে। এই মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের জন্যও আপনিই দায়ী।

একটু থেমে অঞ্জনা দেবী আবার বলে—"এবার এই সব অপরাধের কি শাস্তি হতে পারে সে কথা আপনিই বলুন, পিতাজী!"

মহারাজা ভাঙলেন কিন্তু মচকালেন না। তিনি বলেন—"তোমরা কি চাও?"

অজয় এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মহারাজার কথা শুনে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আপনাকেই করছি তাওজী। আপনি এখন কি চান?"

—অজয়! তুমি ভুলে যাচ্ছ বোধ হয় যে আমি এ রাজ্যের রাজা।

—আপনিও বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, আগামী কাল আপনার পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পন করবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর সিংহগড়ের রাজা থাকবেন না। যাই হোক, আপনি যদি যুবরাজ বিজয় সিংকে গদীতে বসাবার জিদ ছাড়েন, তাহলে আমরা আর কোন উচ্চবাচ্য করতে চাই না; কিন্তু এখনও যদি আপনি আপনার জিদ বজায় রাখতে চান, তাহলে কাল প্রকাশ্য রাজসভায় আপনার সমস্ত অপরাধ প্রমাণসহ উপস্থিত করবো। মনে রাখবেন, কাল রাজসভায় পলিটিক্যাল এজেন্টও উপস্থিত থাকবেন।

এই পর্যন্ত বলে যুবরাজ বিজয়ের দিকে তাকিয়ে অজয় আবার বলে—"তুমি যদি ভালয় ভালয় সিংহাসনের দাবী ছেড়ে সরে দাঁড়াও, তাহলে আমি তোমাকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতা হিসেবে দিতে রাজী আছি। কিন্তু তুমি যদি বাধার সৃষ্টি করতে চাও তাহলে একটি পয়সাও পাবে না। এবার বলো, তুমি কি করতে চাও।"

অজয়ের কথায় যুবরাজ বিজয় বলে—"আমি সিংহাসনের দাবী

—বেশ চলুন। আমি নিজে আপনার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসছি।

অঞ্জনার কথা শুনে মহারাজার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু কোন কথা না বলে তিনি নিঃশব্দে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

অঞ্জনা দেবী তাঁর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পুলিশ সাহেবকে বললেন—"মিঃ রবার্টসন মহারাজাকে তাঁর অভিপ্রেত স্থানে যেতে দাও।

অঞ্জনার কথা শুনে প্রহরীরা তাদের রাইফেল কাঁধে তুলে নিল।

মহারাজা বিদায় নিয়ে চলে গেলে বিজয় সিং সুপ্রিয়াকে বললো—"তুমি কি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী সুপ্রিয়া ?"

সুপ্রিয়া বললো—"রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হলেও তুমি আমার স্বামী। হিন্দু নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করে না।"

সুপ্রিয়ার কথা শুনে বিজয় সিং বললো—"তাহলে কালই আমরা কলকাতা রওনা হবো, কি বলো ?

সুপ্রিয়া বললো, "তা কখনো হয় ? অজয় ঠাকুরপোর কাল রাজ্যাভিষেক। দুদিন আনন্দ করবো না ?"

বিজয় বললো—"বেশ, তোমার যা ইচ্ছা সেই মতই কাজ হবে।"

এই বলে অঞ্জনা দেবীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বিজয় বলে—"মহারাজাকে তুমি পরাজিত করলেও আমাকে পরাজিত করতে পারনি অঞ্জনা। সিংহগড়ের রাজসিংহাসনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান সিংহাসন আমি পেতে যাচ্ছি।

অঞ্জনা বললো—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের মিলিত জীবন সুখের হোক।"

এই সময় শ্যামল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"আমাদের তাহলে ডবল মিষ্টিমুখ হবে আগামী কাল। চমৎকার!"

সবাই হেসে ওঠে শ্যামলের এই হাল্কা কথায়।

এই সময় অজয় বলে—"আপনারা সবাই আজ আমার

এখানেই থাকবেন। সুপ্রিয়া দেবী থাকবেন অঞ্জনার কাছে। চলো অঞ্জনা, এঁদের থাকবার ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।

বিজয়ের দিকে তাকিয়ে অজয় আবার বলে—"তুমি কি তোমার মহলে থাকবে দাদা?"

বিজয় বললো—"না ভাই, আমিও তোমার এখানেই থাকবো। সিংহগড় প্রাসাদে আমার মহল বলে আর কিছু নেই আজ থেকে।"

অঞ্জনা তখন সুপ্রিয়ার হাত ধরে চেয়ার থেকে তুলে বললো—"এস আজ তুমি আর আমি এক ঘরে থাকবো।"

সুপ্রিয়ার হাত ধরে চলতে চলতে অজয়ের দিকে তাকিয়ে অঞ্জনা বলে—"এঁদের ভার এখন তোমাব উপর, আমি চললাম।"

॥ পনের ॥

সিংহগড় রাজ্যে আজ মহা উৎসব। যুবরাজের রাজ্যাভিষেক আজ। সুসজ্জিত উৎসব প্রাঙ্গনে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছে। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূরূপে পলিটিক্যাল এজেণ্ট স্যর ডগলাস হেয়ারওয়েদারও এসেছেন এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে। তিনিই স্বীকৃতি দেবেন নবীন রাজাকে।

সোনার ঝালর দেওয়া এক চাঁদোয়ার নিচে একটি বেদীর উপরে তুখানা সিংহাসন স্থাপিত করা হয়েছে। তার ঠিক পাশেই বসেছেন পলিটিক্যাল এজেণ্ট। তাঁর বাঁপাশে বসেছেন রাজবেশে সজ্জিত যুবরাজ অজয় সিং ও অঞ্জনা দেবী। এরা উভয়েই আজ রাজারাণীর বেশে সজ্জিত। বেদীর অন্যদিকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের মুখোমুখি বসেছেন যুবরাজ দিলীপ সিং ও সুপ্রিয়া দেবী। তাঁদের পিছনে বসেছেন রাজপরিবারের লোকেরা।

বেদীর ঠিক নিচেই কয়েক সারি চেয়ার। তাতে বসেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা। ব্যারিস্টর শ্যামল ঘোষাল, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মিঃ পি. কে. রায়, মিঃ পিলে এবং রঞ্জন চৌধুরীকেও দেখা যাচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে।

মহারাজা নরেন্দ্র সিংজীর জন্য এক বিশেষ সিংহাসন স্থাপিত হয়েছে পলিটিক্যাল এজেণ্টের ডান পাশে। তিনি এখনও আসেননি। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে তিনিই প্রথমে নূতন রাজাকে অভিষেক করবেন এবং তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন।

একটু পরেই রাজপ্রাসাদের নহবৎ বেজে উঠলো। সভায় গুঞ্জন উঠলো—"মহারাজা আসছেন।"

মহারাজা এসে বেদীর উপরে উঠতেই পলিটিক্যাল এজেণ্ট সহ

সবাই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন। পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে করমর্দন করে মহারাজা আসন গ্রহণ করে বললেন—"আমি খুবই অসুস্থ স্যর ডগলাস। দয়া করে যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে ছুটি দিন।"

স্যর ডগলাস তখন মহারাজাকে বললেন—"বেশ, আপনি তাহলে আপনার উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করুন।"

স্যর ডগলাসের কথা শেষ হতেই যুবরাজ বিজয় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"এই সম্পর্কে সভার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে স্যর ডগলাস। দয়া করে আমার বক্তব্যটা আগে বলতে দিন।"

স্যর ডগলাস তাকালেন মহারাজার দিকে। মহারাজা সম্মতি দিলেন মাথা নেড়ে। স্যর ডগলাস তখন দাড়িয়ে উঠে সমাগত নরনারীকে সম্বোধন করে বললেন—"সমাগত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! আজ সিংহগড় রাজ্যের নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। ইংরেজ রাজসরকারের তরফ থেকে আমি এসেছি এই অনুষ্ঠান দেখতে এবং নতুন রাজাকে স্বীকৃতি দিতে। একটু পরেই অভিষেক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে। রাজ্যের বিধান অনুসারে যুবরাজ বিজয় সিং এই রাজ্যের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন আপনাদের কাছে।"

এই বলে বক্তব্য শেষ করে তিনি যুবরাজ বিজয় সিংকে তার বক্তব্য বলতে অনুরোধ করেন।

যুবরাজ বিজয় সিং তখন চেয়ার থেকে উঠে বেদীর ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে সমাগত জনসাধারণের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য বলতে সুরু করেন—

"মহামান্য পলিটিক্যাল এজেন্ট স্যর ডগলাস ও সমাগত সুধীবৃন্দ! আপনারা সকলেই জানেন যে, সিংহগড় রাজ্যের বিধান অনুসারে যুবরাজের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সেই হয় এ রাজ্যের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আপনারা এ কথাও জানেন যে, রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারগণকে অবশ্যই কোন রাজবংশের মেয়ে বিয়ে করতে হবে।

যুবরাজ যদি রাজবংশের মেয়ে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করেন, তাহলে রাজ সিংহাসনের উপরে তার আর কোন দাবী থাকবে না।

আমি তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি যে, এ রাজ্যের রাজ সিংহাসনের উপরে আমার আর কোন দাবী নেই, কারণ আমি সুপ্রিয়া ব্যানার্জী নামে এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছি। কলকাতার 'হোটেল ড্রিমল্যাণ্ড-এ' দিলীপ সিং ছদ্মনামে বাস করবার সময় সুপ্রিয়া ব্যানার্জীকে সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট অনুসারে বিয়ে করেছি। আমাব স্ত্রী সুপ্রিয়া দেবী এখানেই উপস্থিত আছেন। তিনি ছাড়া, যে ম্যারেজ রেজিষ্টার-এর অফিসে আমাদের বিয়ে হয়, সেই ম্যারেজ রেজিষ্টার এবং আমাদের বিয়ের দুজন সাক্ষীও এখানে উপস্থিত আছেন।

এই পর্যন্ত বলে সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে যুবরাজ বলেন—"তুমি এবার আমার পাশে এসো তো সুপ্রিয়া!"

স্বামীর আহ্বানে সুপ্রিয়া চেয়ার থেকে উঠে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে যুক্ত করে সমাগত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায়।

যুবরাজ তখন আবার বলতে স্নুরু করে—"ইনিই আমার স্ত্রী সুপ্রিয়া দেবী।"

এই বলে একটু চুপ করে থেকে যুবরাজ বিজয় সিং আবার বলে—"আমি স্থির করেছি যে, এরপর আমরা কলকাতায় গিয়ে বসবাস করবো। এমতাবস্থায় আমার পরিবর্তে আমার যমজ ভাই অজয়ই এ রাজ্যের রাজ-সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং আমাব পরিবর্তে সেই-ই আজ রাজ সিংহাসনে বসবে। আশা করি মহামান্য পলিটিক্যাল এজেন্ট স্যর ডগলাস অজয়কে সিংহগড় রাজ্যের নতুন রাজা বলে স্বীকৃতি দেবেন।

আমার আর কোন কিছু বলবার নেই। শুধু এই কথাটাই আর একবার বলছি যে, সুপ্রিয়া দেবী আমার বিবাহিতা স্ত্রী, এবং তাকে স্ত্রীরূপে লাভ করে আমি সুখী হয়েছি। আশা করি, আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন।"

জনতার ভিতর থেকে ধ্বনিত হলো—"যুবরাজের জয় হোক।"

বিজয় সিং হেসে বললো—"আর আমি যুবরাজ নই বন্ধুগণ, এখন থেকে আমিও আপনাদেরই মত সিংহগড় রাজ্যের একজন প্রজা। এই বেদীতে বসবার অধিকারও আমার নেই, আমি তাই এখান থেকে নেমে গিয়ে আপনাদের মধ্যেই বসছি।"

এই বলে সুপ্রিয়ার হাত ধরে বেদী থেকে নেমে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত চেয়ারগুলির মধ্যে দুটি চেয়ারে বসে পড়ে ওরা।

পলিটিক্যাল এজেন্ট তখন মহারাজার দিকে তাকিয়ে বলল—"এবারে আপনার করণীয় কাজটুকু সেরে ফেলুন ইয়োর হাইনেস্।"

পলিটিক্যাল এজেন্টের অনুরোধে মহারাজা নরেন্দ্র সিংজী তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে বলল—"সমাগত প্রজাবৃন্দ! আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। তাছাড়া রাজ্যের বিধান অনুসারে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছি। এ অবস্থায়, রাজ-সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীমান অজয় সিংকেই আমি আজ আপনাদের নতুন রাজা বলে ঘোষণা করছি।

এই বলে অজয় আর অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে মহারাজা বলেন—"এসো অজয়, তুমিও এসো বৌ-রাণী, তোমাদের নিজের নিজের আসনে বসো।"

মহারাজার নির্দেশে যুবরাজ অজয় এবং অঞ্জনা দেবী উঠে গিয়ে পূর্বোক্ত রাজসিংহাসন দুটিতে বসে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি একটা পিস্তলের আওয়াজ করেন এবং একটু পরেই স্ুরু হয় তোপের আওয়াজ। পর পর একুশবার তোপধ্বনি করে সংবর্ধনা করা হয় নূতন রাজাকে।

তোপধ্বনি থামলে স্যর ডগলাস দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করেন—"মহামান্য ভাইসরয়ের নির্দেশে হিজ ম্যাজেষ্টি দি এমপারার অব ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে আমি হিজ হাইনেস অজয় সিংকে সিংহগড় রাজ্যের রাজা বলে এবং হার হাইনেস অঞ্জনা দেবীকে রাণী বলে স্বীকার করে নিচ্ছি।

এ ছাড়া, হিজ ম্যাজেষ্টির তরফ থেকে নতুন রাজাকে স্যর এবং কে, সি, আই, ই উপাধি দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি।"

সমাগত জনতা করতালি ও "মহারাজা অজয় সিং কী জয়" "মহারাণী জী কি জয়" ধ্বনি দ্বারা নতুন রাজা ও রাণীকে অভিনন্দন জানাতে সুরু করলো।

সমাগত জনতা যখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, এই সময় ভূতপূর্ব মহারাজা এক অভূতপূর্ব কাণ্ড করে বসলেন। তিনি তাঁর পকেট থেকে একখানা সিল করা খাম বের করে স্যর ডগলাসের হাতে দিয়ে বলেন—"এতে আমার কিছু স্বাকারোক্তি আছে। আমার মৃত্যুর পর এটি আপনি খুলে পড়বেন এবং এর মর্মকথা যথাযোগ্য স্থানে জানিয়ে দিবেন। এই আমার অনুরোধ।"

খামখানা স্যর ডগলাসের হাতে দিয়ে তিনি আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। এর পর পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে তার নলটি বুকে টেকিয়ে গুলি করলেন। রিভলভারের গুলি মহারাজার হৃতপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার থেকে নিচে পড়ে যান। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি সংঘটিত হলো যে, কেউ বাধা দেওয়ার সময় পেলো না।

গুলির আওয়াজ এবং মহারাজকে পড়ে যেতে দেখে অঞ্জনা দেবী চিৎকার করে ওঠে—"পিতাজী আত্মহত্যা করেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে যায় মহারাজার কাছে। রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ক্যাপ্টেন এস, কে, গুপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

স্যর ডগলাসের অনুরোধে তিনি মহারাজাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই শোকাবহ ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি নয়। মৃত মহারাজার অনুরোধক্রমে স্যর ডগলাস সেখানে দাঁড়িয়েই সেই সীলকরা খামখানা মহারাজার স্বীকারোক্তিটা পড়েন।

পড়বার পর তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান।

তিনি তখন উদ্বেলিত ও ভীত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন—"আপনাদের সামনে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা আপনারা সবাই দেখেছেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনার চাইতেও মর্মান্তিক ও দুঃখজনক কিছু বিষয় আমি আপনাদের কাছে বলবো। আপনাদের কোন ভয় নেই। দয়া করে স্থির হয়ে বসুন আপনারা।"

পলিটিক্যাল এজেন্টের কথায় কাজ হলো। জনতার মধ্যে অনেকেই সভাস্থল পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু তখনও যারা ছিল তারা আবার বসে পড়লো স্যর ডগলাসের কথা শুনতে।

স্যর ডগলাস বললেন—"আত্মহত্যা করবার কয়েক সেকেণ্ড আগে মহারাজা আমার হাতে একখানা সীল করা খাম দিয়ে বলেন যে, খামের ভিতরে তাঁর স্বীকারোক্তি আছে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর আমি যেন স্বীকারোক্তিটা পড়ি এবং যথাযোগ্য স্থানে ব্যক্ত করি। আমি এইমাত্র স্বীকারোক্তিটি পড়লাম। এতে এমন সব গুরুতর বিষয় লেখা আছে, যে কথা জন-স্বার্থের খাতিরে এবং বিশেষ করে ভবিষ্যতে বিজয় সিংহের জীবনের নিরুপত্তার জন্য এখুনি প্রকাশ করা দরকার মনে করেছি।"

এই বলে স্যর ডগলাস স্বীকারোক্তিখানা খুলে পড়তে সুরু করলেন—"

"আমি শ্রীনরেন্দ্র সিং সজ্ঞানে এবং সুস্থ শরীরে এই স্বীকারোক্তি করছি যে, যুবরাজ বিজয় সিংয়ের বিয়ের খবর পেয়ে আমি তার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে কলকাতা যাই। বিজয় সত্যি সত্যিই সুপ্রিয়া ব্যানার্জী নামে এক বাঙালী অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছে শুনে আমি খুবই মর্মাহত হই। যুবরাজ বিজয় দিলীপ সিং ছদ্মনামে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল।

এই ঘটনার কথা জানতো নন্দকিশোর গুপ্ত নামে একজন রাজ-কর্মচারি। নন্দকিশোর তখন কলকাতার 'হোটেল এভারেষ্ট' নামক

এক হোটেলে বাস করছিল। আমি তখন বিজয়কে সিংহগড়ে পাঠিয়ে দিই এবং তার কাছ থেকে তার ব্যবহার্য একটি স্যুট চেয়ে নিই। আমার মনে হয় যে, সুপ্রিয়া দেবী আর নন্দকিশোরকে হত্যা করলেই বিজয়ের পথের কাঁটা দূর হবে।

এই রকম মনে করে আমার এক অনুচরকে পাঠাই সুপ্রিয়া দেবীকে হত্যা করতে। সে সুপ্রিয়া দেবীর পরিবর্তে ভুল করে মায়া মিত্র নামে অন্য এক অভিনেত্রীকে হত্যা করে। সে বা আমি কেউই প্রথমে সন্দেহ করিনি যে, হত্যার ব্যাপারে এই রকম একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি ধরে নিই যে, সুপ্রিয়াকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর আমি নন্দকিশোরের হোটেলে গিয়ে আমার হোটেলের ঘরে ডেকে নিয়ে আসি। রাত প্রায় দশটার সময় একখানা ট্যাক্সি করে নন্দকিশোর এবং আমার সেই অনুচর দক্ষিণেশ্বরে যাই। ট্যাক্সিখানা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাইরে রেখে আমরা তিনজনে মন্দিরের উত্তরে গঙ্গার ধারে একটা নির্জন স্থানে গিয়ে বসি। আমি তখন নন্দকিশোরকে এবং আমার সেই অনুচরকে গঙ্গা স্নান করে আসতে বলি। আমার আদেশ অমান্য করবার শক্তি নন্দকিশোরের ছিল না। সে তখন আমার অনুচরের সঙ্গে জলে নামে। আমার অনুচরের দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। নন্দকিশোর জলে ডুব দিতেই সে তাকে জোর করে জলের নিচে ডুবিয়ে রাখে। মিনিট দশ পনের জলের তলায় ডুবিয়ে রাখার ফলে নন্দকিশোর মারা যায়। অনেকখানি জলও তার পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। আমার অনুচর তখন নন্দকিশোরের মৃত-দেহটি উপরে তুলে আনে। যুবরাজ বিজয়ের স্যুটটি আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্যুটটি মৃত নন্দকিশোরের দেহে পরিয়ে দেওয়া হয়। পরাবার পর দেখা যায় যে, প্যান্টের কোমরটা ঢিলা হয়েছে। আমার অনুচর তখন তার নিজের বেল্ট খুলে মৃতদেহের কোমরে পরিয়ে দেয়। এরপর নন্দকিশোরের মৃতদেহটি আমরা জলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমার অনুচর পা দিয়ে তার দেহটি জলের তলায় মাটির উপরে

চেপে ধরে মাথাটা টেনে ছিঁড়ে নেয়। আগেই বলেছি, আমার অনুচরের দেহে অসুরের শক্তি ছিল তাই নন্দকিশোরের মৃতদেহ থেকে মাথাটা টেনে ছিঁড়ে নিতে তার পক্ষে কঠিন হয়নি। সে তখন আমার নির্দেশে নন্দকিশোরের মাথাটা একখানা ভোজালীর সাহায্যে টুকরো টুকরো করে কেটে টুকরোগুলো জলে ফেলে দেয়। নন্দকিশোরের জামা-কাপড়ও পৌটলা করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। মৃতদেহটি যাতে হোটেল ড্রিমল্যাণ্ডের বাসিন্দা দিলীপ সিংয়ের বলে সাব্যস্ত হয় এই উদ্দেশ্যে কোটের পকেটে দিলীপসিংয়ের নাম ছাপা কার্ড, ড্রিমল্যাণ্ডের দেনা পরিশোধের বিল এবং মানিব্যাগে পাঁচ'শ টাকা রেখে দিই আমি।

একাজ করবার উদ্দেশ্য হলো এই যে, সুপ্রিয়া দেবীর হত্যার তদন্তে গিয়ে পুলিশ স্বাভাবিক ভাবেই দিলীপ সিংয়ের খোঁজ করবে। কিন্তু দিলীপ সিং যদি মৃত বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে ব্যাপারটার ওখানেই পরিসমাপ্তি হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে আমি যখন জানতে পারি যে সুপ্রিয়া বেঁচে আছে এবং যুবরাজ্ঞী অঞ্জনা সমস্ত অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং যুবরাজ বিজয়ও সিংহাসনের চেয়ে সুপ্রিয়াকেই বেশি ভালবাসে, তখন আমার পক্ষে অজয়কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। অন্যদিকে, সুপ্রিয়া দেবী কলকাতায় বিশেষ ভাবে পরিচিতা। সবাই জানে যে, দিলীপ সিংয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তার স্বামী দিলীপ সিং জলে ডুবে মারা গেছে। এখন যদি সেই দিলীপ সিং আবার কলকাতায় গিয়ে সুপ্রিয়ার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে, তাহলে পুলিশ তাকে সহজে ছাড়বে না। এবং পুলিশী তদন্তে ভবিষ্যতে কেঁচো খুঁড়তে নিশ্চয়ই সাপ বেরিয়ে পড়বে।

এইসব কথা চিন্তা করে এবং বিশেষ করে বিজয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে আমি সজ্ঞানে' সুস্থ-শরীরে, স্বেচ্ছায় এবং কারো দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে এই স্বীকারোক্তি নিজের হাতে লিখে নিজের নাম সই করে যাচ্ছি।

আমি জীবিত থাকতে এ স্বীকারোক্তি যাতে কেউ পড়তে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমি স্থির করি যে, স্বীকারোক্তিখানা রাজ্যের পলিটিক্যাল-এজেন্টের হাতে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করবো যে, তিনি যেন এটা আমার মৃত্যুর পর পাঠ করেন।

স্বীকারোক্তিখানা পলিটিক্যাল এজেন্টের হাতে দেবার পরেই আমি আত্মহত্যা করবো। আমার মৃত্যুর জন্য আমি নিজেই দায়ী একথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে রাখছি এখানে।

স্বীকারোক্তিখানা যতক্ষণ পড়া হচ্ছিল, সভায় তখন কারো মুখেই কোন কথা ছিলনা। পড়া শেষ হলে বিজয় সিং কেঁদে উঠে বললো—"তাওজীর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী, আমার জন্যই এত সব অপরাধের কাজ করে গেছেন তিনি। আমাকে শাস্তি দাও অজয়।"

নতুন মহারাজা অজয় বললেন—"তুমি তো কোন অপরাধ করোনি দাদা। যাই হোক এসো এবারে আমরা তাওজীর সৎকারের ব্যবস্থা করি।"

পলিটিক্যাল এজেন্ট বললেন—"তাই করুন ইয়োর হাইনেস। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।"

স্যর ডগলাস চলে যেতেই সমাগত জনসাধারণও চলে যেতে লাগলো সভা থেকে। সেই রাত্রেই দাহ করা হলো মহারাজা নরেন্দ্র সিংয়ের মৃতদেহ।

পূর্বোক্ত ঘটনার একমাস পরের কথা।

সুপ্রিয়া চোখ বুজে শুয়ে আছে খাটের ওপরে। বেলা তখন প্রায় দুটো। এই সময় বিজয় ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়াকে ঘুমোতে দেখে ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে বসে। তারপর মুখটি নামিয়ে সুপ্রিয়ার ওষ্ঠাধার আস্তে করে একটা চুমু দেয়।

সুপ্রিয়া চোখ মেলে মৃদু হেসে বলে—"এটা কি হচ্ছে শুনি?"

॥ সমাপ্ত ॥